আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে

আনিসুল হক

আনিসুল হক

আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে

আনিসুল হক

আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে

ইতি প্রকাশন

পঞ্চম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০১০
চতুর্থ প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০৮
তৃতীয় প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : ২১ বইমেলা ২০০৪
© : পারমিতা
প্রকাশক : মোঃ জহির দীপ্তি
১১/১ বাংলাবাজার, (ইসলামী টাওয়ার) (২য় তলা), ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭১১৭৩৮৪৮২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
কম্পিউটার : সিফাত কম্পিউটার
মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স
মূল্য : ৮০.০০

Amadar Classa Acta Pori Pora by Anisul Huque
Published by Eti Prokashon
Islami Tower (1st floor) 11/1 Banglabazar Dhaka-1100
Third Edition : Ekushey February Book Fair 2010
Price : 80.00 Taka. US $: 4.00
www.etiprokashon.com
e-mail : eti.prokashon@yahoo.com

ISBN : 984-864-001-X

উৎসর্গ

এই গল্পগুলোও আসলে পদ্যকে ঘুমপাড়ানোর জন্যে বলা

সূচি

আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে / ৯
গুড্ডু বুড়া / ১৫
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে রাগিও না / ১৯
চকলেট, লজেন্স আর চুইংগাম / ২৩
কালরাত্রি / ২৮
বেঁটে ভূত / ৩৪
আকাশ কাঁদে, আকাশ হাসে / ৩৮
আত্মা-রহস্য / ৪২
এক যে ছিল ডিম / ৪৭
জয় ফড়িং জাতির জয় / ৫২
কাগজকে চিনি বানানোর মন্ত্র / ৫৫

আনিসুল হকের শিশু-কিশোর গ্রন্থ

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আমাদের বাসায় চোর আসে
দুঃখপরী সুখপরী
শহরে অদ্ভুত জন্তু
শিপরা
কাকের নাম সাবানি

আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে

আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে। সাদা পরী। তার নাম গুনগুন।

আমার নাম পদ্য। আমি পড়ি নার্সরি ক্লাসে। আমাদের ক্লাসে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রী। আমাদের মধ্যে যে একটা পরীর মেয়ে আছে, সে কথা আমি জানি, আর কেউ কিন্তু জানে না। পরীরা হয় চাঁদের আলোর তৈরি। গুনগুনও তাই। সে ক্লাসে সব সময় আমার পাশের সিটে বসে। আমার সাথেই কথাবার্তা বলে। ছুটির পর আমাদের সবাইকে নিতে গার্জিয়ানরা আসেন। আর গুনগুনকে নিতে আসেন তার মা। তিনিও একজন পরী। নীল পরী। তার পিঠে একজোড়া পাখা আছে। সেই পাখা মেলে তিনি উড়তে থাকেন। এক হাতে ধরে থাকেন গুনগুনকে। তারা দুজন ডানা নেড়ে উড়তে থাকে। আমি তাদের হাত নেড়ে বিদায় দেই। তারা আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসে।

আমি ছাড়া আর কেউ গুনগুনকে দেখতে পায় না। টিফিন পিরিয়ডে সবাই যখন খেলতে যায়, আমি আর গুনগুন ক্লাসেই বসে থাকি। আমি গুনগুনের সাথে নানা গল্প করি।

যেমন ধরা যাক, একদিন টিফিন পিরিয়ডে আমি হয়তো গুনগুনকে জিগ্যেস করলাম, গুনগুন, আজ কি টিফিন এনেছ?

গুনগুন বললো, ফুলের মধু।

কী ফুলের মধু?

পদ্ম ফুলের।

মধু ছাড়া তুমি বুঝি আর কিছু খাও না?

খাই তো।

কী খাও?

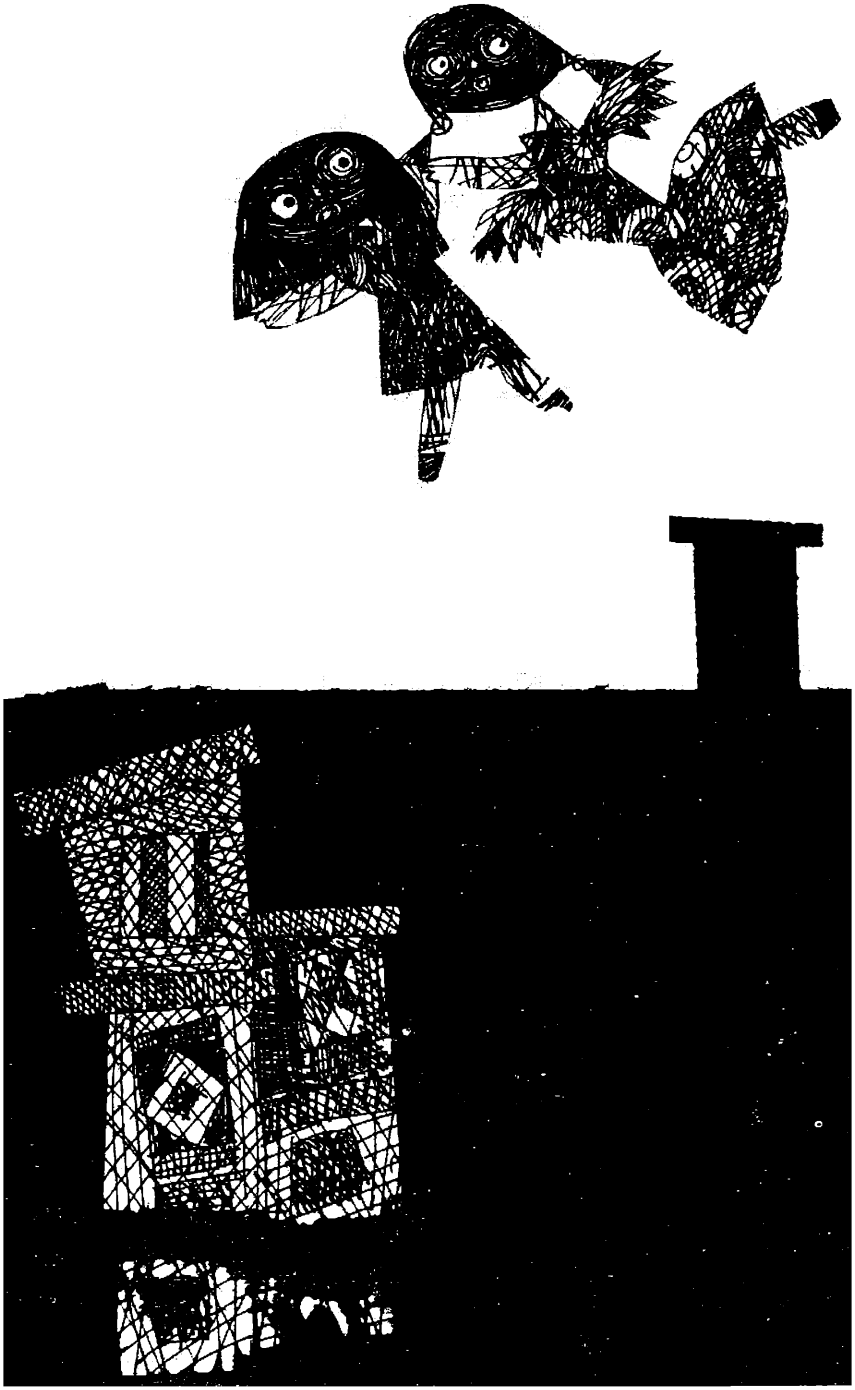

ভোর বেলাকার শিশির খাই। সবুজ ঘাসে যে শিশির লেগে থাকে, সেই শিশির। তুমি কী টিফিন এনেছ?

আমি? বিস্কুট আর পনির। তুমি খাবে?

না। আমার মনে হয় এসব আমার খাওয়া চলবে না। তুমি কি একটু পদ্মফুলের মধু খেয়ে দেখবে?

দাও তো দেখি একটু।

আমি গুনগুনের কাছ থেকে নিয়ে একটু মধু খেলাম। এত মজা! আইসক্রিমের চেয়েও মজা! আমার পেট ভরে গেলো। আমি আর বিস্কুট পনির কিছুই খেলাম না। বাসায় ফেরার পর মা জিগ্যেস করলেন, এই পদ্য, তুমি টিফিন খাও নি কেন?

আমি বললাম, আমার পেট ভরা ছিল। কিছুই তো খেতে ইচ্ছা করে নি।

মা রেগে গেলেন। আমি বললাম, মা, আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে টিফিন খেয়েছি। মা জিগ্যেস করলেন, কোন বন্ধু?

আমি বললাম, সেকথা তোমাকে বলা যাবে না মা।

মা আমার দিকে সন্দেহ ভরা চোখে তাকালেন। মনে হলো তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি।

টিফিন পিরিয়ডে আমি একদিন গুনগুনের সাথে গল্প করছি। গুনগুনকে বললাম, গুনগুন, তুমি মানুষের স্কুলে ভর্তি হয়েছ কেন?

গুনগুন বললো, ভর্তি হইনি তো। স্কুলের খাতায় নাম নেই। শুধু এসে ক্লাস করি। বেতনও দেই না।

আমি বললাম, তা হলে ক্লাস করো কেন?

সে জবাব দিলো, আমাদের পরীর রাজ্যে খুব ভর্তির সমস্যা। স্কুলে সিট পাওয়া যায় না। সে জন্যে আমার মা আমাকে মানুষের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। এখানেই আমি সব লেখাপড়া শিখে নিচ্ছি।

আমি আর গুনগুন এসব গল্প করছি, হঠাৎ আমাদের টিচার ক্লাসে এসে *(গেলেন) বললেন*, এই পদ্য, তুমি কার সাথে কথা বলছ?

গুনগুন আমাকে ইশারা করে নিষেধ করলো, আমি যেন টিচারকে ওর কথা বলে না দিই। আমি বললাম, কই নাতো? আমি তো কথা বলছি না।

আমি গুনগুনকে জিগ্যেস করেছি, গুনগুন, আমি তো তোমাকে দেখতে পাই। তোমার সাথে কথা বলি। তোমার আনা টিফিন খাই। কিন্তু অন্য কেউ তোমাকে দেখতে পায় না কেন ?

গুনগুন জবাব দিয়েছে, আমি তো পরী। সে জন্যে আমি লুকিয়ে থাকি। কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পাও, কারণ তোমার কপালে আমার মা একটা চুমু দিয়েছিলেন।

চুমু ? তোমার মা ? নীলপরী খালাম্মা ? কবে ?—আমি জিগ্যেস করলাম।

গুনগুন বললো, যেদিন তোমার জন্ম হয়েছিল, সেদিন। কেন ? তোমার মা তোমাকে ছড়া শোনান নি--

খুকুমণি জন্ম নিলো যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এলো কতই খুশি ভরে,
আদর করে দুধ খাওয়ালো সোনার পেয়ালাতে,
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়ালো জ্যোৎস্নামাখা রাতে।

'হ্যাঁ, শুনিয়েছেন। সেই পরীদের মধ্যে বুঝি তোমার মাও ছিলেন ?'

'মা তো তাই বলেন।'

একদিন টিফিন পিরিয়ডে সবাই যখন খেলছে, আমি গুনগুনকে বললাম, আমার না খুব আকাশে উড়তে ইচ্ছা করছে। আমার ছোটবেলায় মা-বাবা আমাকে নিয়ে প্লেনে চড়তেন, দাদার বাড়ি যেতেন, এখন আর যান না। বলেন, নারে, আজকালকার প্লেন, খুব একসিডেন্ট করে। গুনগুন, আমাকে নিয়ে একটু আকাশে উড়বে।

গুনগুন বললো, আমি তো তোমাকে নিয়ে বেশিদূর উড়তে পারবো না। ওই ছাদের উপরে যেতে পারবো মাত্র। মা যদি থাকত, তা হলে তোমাকে নিয়ে একদম আকশের ওপরে মেঘের গায়ে উঠে যেতে পারতেন।

'ঠিক আছে, ছাদের ওপরেই চলো যাই।' আমি গুনগুনের পিঠে উঠে বসলাম। গুনগুন উড়তে লাগলো। আমরা দুজন অনেক উপরে উঠে গেলাম। নিচে তাকিয়ে আমার খুবই ভয় করতে লাগলো। খানিকক্ষণ পর মজা পেয়ে গেলাম। উড়তে উড়তে অনেক দূর চলে এসেছি। নিচে ধানমণ্ডি লেক আর রাস্তাঘাট আর মানুষগুলোকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, খেলনা লেক, খেলনা মানুষ, খেলনা গাড়ি।

যখন স্কুলে ফিরে এলাম তখন দেখি মহা হৈচৈ। আমরা চুপ করে স্কুলের মাঠে নেমেছিলাম।

তারপর আমি দৌড়ে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লাম।

টিচার কেঁদে ফেললেন। বললেন, পদ্য এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

আমি বললাম, এই তো মাঠে খেলছিলাম।

টিচার বললেন না তো, তুমি তো মাঠে ছিলে না। ঠিকমতো বলো, কোথায় ছিলে?

টিচার আমার মাকে ডেকে এনে নালিশ করলেন। বললেন, পদ্য কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আর সারাক্ষণ একা একা কথা বলে।

আমাদের বাসার সবাই খুব মন খারাপ করলো। সবার ধারণা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই দেখে আমি মাকে বললাম, মা, আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে। তার নাম গুনগুন। আমি ওর সাথেই কথা বলি।

মা আমার কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। মনে হয় আমার কথা তার বিশ্বাস হলো না।

মা স্কুলের টিচারকে বললেন, মেয়ে আমার একটু কল্পনা করে বেশি। ওর ধারণা ওর একটা বন্ধু আছে পরী, ও সেই বন্ধুর সাথে গল্প করে।

টিচার বললেন, তাই হবে।

মা চলে যাওয়ার পর আমি টিচারকে বললাম, মিস, আমাদের ক্লাসে সত্যি সত্যি একটা পরী পড়ে। আমি তাকে দেখতে পাই। আর কেউ পায় না।

মিস হাসলেন। তার হাসি দেখে আমার খুব কান্না পেলো। ইস মিস আমাকে বিশ্বাস করছেন না। কী করা যায়?

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। মিস আমাদের স্কুলের খাতায় হ্যান্ড রাইটিং দিয়েছিলেন। সবাই এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখে জমা দিয়েছে। গুনগুনও দিয়েছে।

আমি বললাম, মিস, আজকে আমরা ক্লাসে মোট কতো জন উপস্থিত আছি, একটু গুনে দেখুন না?

মিস গুনে বললেন, ২২ জন।

আমি বললাম, এবার একটু গুনে দেখুন তো আপনার কাছে খাতা জমা পড়েছে কয়টা?

মিস গুনলেন। তার চোখমুখ লাল হয়ে গেলো। তিনি আবার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গুনলেন। ২২ জনই তো উপস্থিত হয়েছে। তার হলে খাতা ২৩টা হচ্ছে কেন?

আমি আর গুনগুন মিটমিট করে হাসতে লাগলাম।

ছুটির পর নীল পরী খালাম্মা যখন গুনগুনকে নিতে এলেন, আমি বললাম, খালাম্মা, এক কাজ করুন না প্লিজ, আমাদের সব বন্ধুকেই আপনি চুমু দিয়ে দিন। তাহলে সবাই আপনাদের দেখতে পাবে।

খালাম্মা বললেন, তুমি যখন বলছ, তাই করতে হবে।

পরদিন ক্লাসে যখন সব ছাত্রছাত্রী এসে গেলো, নীলপরী খালাম্মা সবাইকে চুমু দিয়ে দিলেন। ব্যাস ক্লাসের সবাই গুনগুন আর তার মাকে দেখতে পেলো আর তাদের কথা শুনতে পেলো।

সবাই একযোগে চিৎকার করে উঠলো, আমাদের ক্লাসে একটা পরী পড়ে।

টিচার বললেন, মানছি মানছি বাবা পড়ে, এখন সবাই চুপ করো। এ-কথা অন্যরা শুনে ফেললে অযথা হৈচৈ হবে। সংবাদপত্রে লেখালেখি হবে। তখন আর পরীর মেয়েটা পড়তেই পারবে না।

তাই তো। তাই তো। আমরা সবাই ঠিক করলাম, এ-কথা আর কাউকে বলা যাবে না।

এখন গুনগুন রোজ আমাদের ক্লাসে আসে। আমাদের সাথে ক্লাস করে। আমাদের সাথে গল্পগুজব করে। আমাদের নানা ফুলের মধু খেতে দেয়। মিস তার খাতাও দেখে দেন। তবে এই নিয়ে তিনি কাউকে কিছু বলেন না। আমরাও বলি না। কী দরকার বাবা, একটা বন্ধু পেয়ে সে বন্ধুকে হারানোর।

গুড্ডু বুড়া

গুড্ডু বুড়ার নাম বুড়া হলেও আসলে সে বুড়া নয়। তার বয়স মাত্র ৬ বছর। সবাই তাকে আদর করে ডাকে গুড্ডু বুড়া বলে। গুড্ডু বুড়া ছেলেটা খুবই বোকাসোকা। সব সময় সে উল্টা বোঝে, আর উল্টাপাল্টা কাজকর্ম করে। আর কক্ষনো কিছু মুখে দিতে চায় না।

একদিন তার বাবা তাকে একটা জম্বুরা কিনে দিলেন। সে ভাবলো, এটা বুঝি বল। সে জম্বুরা নিয়ে খেলতে লাগলো। বাবা বললেন, এই গুড্ডু, পাকা জম্বুরা দিয়ে কেউ বল খেলে নাকি। আমরা ছোটবেলায় জম্বুরা দিয়ে বল খেলেছি বটে, কিন্তু সে তো কাঁচা জম্বুরা।

গুড্ডু বুড়া বললো, ভুল হয়ে গেছে বাবা, আমি ভেবেছিলাম এটা একটা বল।

এরপর বাবা ভাবলেন, ছেলেকে একটা বল কিনে দেওয়া দরকার। তিনি একটা ছোট্ট সবুজ প্লাস্টিকের বল কিনে অনলেন গুড্ডু বুড়ার জন্যে। এবার গুড্ডু বুড়া ভাবলো কী, এটা মনে হয় জম্বুরা কি অন্য কোনো লেবু। সে একটা চাকু নিয়ে বসলো বলটা কাটতে।

তাদের বাসায় ছিল একটা টিয়াপাখি। টিয়াপাখির ঠোঁট লাল। গুড্ডু বুড়া ভাবলো, ইস আমার ঠোঁটটাও যদি এমন করে লাল করা যেত। সে গেলো ড্রেসিং টেবিলে। মায়ের লিপস্টিকটা নিয়ে ঘষতে লাগলো ঠোঁটে। কিন্তু তার মা সেটা দেখে ফেললেন। এই পাগল ছেলে, ছেলেরা কখনও ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় নাকি। তিনি লিপস্টিকটা কেড়ে নিলেন।

গুড্ডু বুড়া খুব মন খারাপ করলো। তারপর ভাবতে লাগলো, আচ্ছা টিয়া পাখির ঠোঁট কেন লাল ? এর কারণ কী ? অনেক ভেবে সে বের করলো, টিয়া

পাখি তো লাল টুকটুকে পাকা মরিচ খায়, তাই তার ঠোঁট লাল। সে ঠিক করলো, সেও পাকা মরিচ খাবে।

মা-বাবার যন্ত্রণায় এসব করা যায় না। যেদিন বাসায় কেউ থাকবে না, সেদিন করতে হবে।

একদিন বাসায় কেউ নেই। গুড্ডু বুড়া একটা পাকা মরিচ বেছে নিয়ে কচকচ করে খেতে লাগলো।

ঝালে তার মাথার মগজ মনে হয় ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সে পাগলের মতো লাফাতে লাগলো। দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে খেয়ে নিলো কমোডের পানি। তাতেও তার ঝাল যায় না। তারপর সে ছুটে গেলো রান্নাঘরে, চিনির কৌটার খোঁজে। চিনি ভেবে সে যা মুখে দিলো, তা হলো লবণ। উফ, বাবারে মরে গেলাম রে। শেষে পাওয়া গেলো চিনির কৌটা। মুঠো মুঠো চিনি খেয়েও তার মুখ থেকে ঝাল আর যায় না। বমিটমি করে সে ঘরদোর ভাসিয়ে দিলো।

বাবা-মা ফিরে এসে সব দেখে শুনে কাঁদতে লাগলেন। হায় হায় তাদের ছেলে এতো বোকা হলো কী করে ?

তাকে তারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার সবকিছু শুনে নানা পরীক্ষা করে বললেন, আপনাদের ছেলের সবই ভালো, তবে ওর বুদ্ধিটা বাড়ে নি। এর কারণ ও খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করে নি।

আয়োডিন না খেলে, ভিটামিন এ না খেলে মানুষ এমনিতেই বোকা হয়।

গুড্ডু বুড়াকে এক কাজ করতে হবে। এখন থেকে সব কিছু ঠিকমতো খেতে হবে। এটা খাবো না ওটা খাবো না, বলা চলবে না। গুড্ডু, আজ থেকেই ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া শুরু করে দাও, দেখবে, তোমার মাথায় কতো বুদ্ধি হয়!

এরপর থেকে গুড্ডু বুড়া ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে লাগলো। এবং সত্যি সত্যি ডাক্তারের কথা ম্যাজিকের মতো ফলে গেলো। গুড্ডু বুড়া হয়ে উঠলো খুবই বুদ্ধিমান। সে এমন কি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে গেলো।

পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াই বা এমন কী কঠিন কাজ! প্রত্যেক বছর প্রত্যেক স্কুলের প্রতিটা ক্লাসে তো একজন করে ফার্স্ট হয়ই। কিন্তু বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মতো বুদ্ধি কজনের হয়!

একদিনের ঘটনা। দুপুর বেলা। বাসায় কেউ নেই। স্কুল থেকে এসে গুড্ডু বুড়া দিয়েছে এক ঘুম। মা বাইরে যাবার আগে বলে গেছেন দরজা জানালা

ঠিকভাবে লাগিয়ে রাখতে। গুড্ডু বুড়া শোওয়ার আগে একশ বার করে দেখে নিয়েছে, দরজা জানালা সব ঠিক মতোই লাগানো আছে। অথচ তার ঘুম ভেঙে গেলো খুটখুট শব্দে। সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, একটা অপরিচিত লোক পা টিপে টিপ হাঁটছে। মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে ঘরের নানা জিনিস এনে তার ওপর রাখছে। গুড্ডু বুড়ার বুঝতে বাকি রইলো না, ঘরে চোর ঢুকেছে। এখন যদি সে চিৎকার করে চোর চোর বলে, তাহলে তো চোর এসে নির্ঘাত তার গলা টিপে ধরবে। কী করা যায় ? সে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভেবে নিলো পরিস্থিতি। তারপর আস্তে করে উঠে বসে বললো, আচ্ছালামো আলায়কুম, মামা কখন এলেন ? শরীর ভালো ? মামী ভালো ?

চোর তো প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। পরে ভাবলো, বোকা ছেলে আমাকে মামা ভেবেছে। সে উত্তর দিলো, হ্যাঁ বাবা ভালো আছি। তোমার মা কই ?

মা-র আসতে দেরি আছে। আপনি বসেন।

চোর সাহেব বসবার ঘরে গিয়ে বসলো।

গুড্ডু বুড়া বললো, মামা দাঁড়ান, আপনাকে নাশতা দেই।

চোর বললো, আরে নানা, নাশতা দিতে হবে না।

গুড্ডু বুড়া বললো, না মামা, রান্না ঘরে আপনার জন্যে মা গরম গরম পিঠা রেখেছেন, বসেন, নিয়ে আসি।

গুড্ডু বুড়া রান্না ঘরে গেলে। গিয়েই চিৎকার করে উঠলো, মামা, আগুন, আগুন।

ভয় পেয়ে চোরও চিৎকার করে উঠলো, আগুন আগুন।

সেই চিৎকার শুনে আশেপাশের বাসার মানুষজন সব বেরিয়ে আসতে লাগলো হুড়হুড় করে। দারোয়ান সব ছুটে এলো, কোথায় আগুন, কোথায় ?

তখন গুড্ডু বুড়া দেখিয়ে দিলো চোরকে। আগুন নারে ভাই, ঘরে চোর ঢুকেছে, ওকে ধরেন।

সবাই বুঝে ফেললো গুড্ডুর চালাকি।

চোর সাহেব খুব ভয় পেয়ে গেছেন। দারোয়ানরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

গুড্ডু বুড়া বললো, আচ্ছালামু আলায়কুম মামা, নাশতাটা দিতে পারলাম না, ওটা থানায় গিয়েই খাবেন। কেমন ?

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে রাগিও না

রতনপুরের ঘুমপাড়ানি বুড়ি থাকেন পাট কোম্পানির গুদামে। অবশ্য পাট কোম্পানিটা আর নেই, গুদামটা পড়ে আছে। বিশাল টিনে-ছাওয়া ঘর, পাকা মেঝে। ঘুমপাড়ানি বুড়ির থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। অবশ্য ঘুমপাড়ানি বুড়িকে বুড়ি বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা উচিত হচ্ছে না। পুরো শহর তাকে ডাকে মাসিপিসি বলে। তিনি হলেন শহরের কমন মাসিপিসি। কারণ মাও তাকে ডাকে মাসিপিসি, মেয়েও তাকে ডাকে মাসিপিসি। দাদা থেকে নাতি—সবার তিনি মাসিপিসি। যিনিই মাসি তিনি পিসি—এ বড় মজার সম্বন্ধ।

তাকে ডাকার তো সব সময় প্রয়োজন হয় না। রাতে বিছানায় যাওয়ার পরই কেবল তার কথা সবার মনে পড়ে। তখন তাকে ডাকার মন্ত্রটা লোকেরা পড়ে ফেলে।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালঙ্ক নাই চোখ পেতে বসো
বাটা ভরা পান দেবো গাল ভরে খেও
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।

শুধু এই মন্ত্রটা পড়লেই হয় না। পাশে শোয়া খোকা বা খুকুর গায়ে আস্তে আস্তে চাপড়ও দিতে হয়। ব্যস, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ওই বাসায় চলে যান। খোকাই হোক, খুকুই হোক, তার চোখে গিয়ে বসেন। তারপর তার ঝোলার ভেতর থেকে ঘুম বের করে খোকা বা খুকুকে দিয়ে দেন।

খোকা-খুকু ঘুমিয়ে পড়লে তাদের বাবা-মাও ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। কারণ, কথা ছিল, তাকে বাটা ভরা পান দেওয়া হবে, তিনি গাল ভরে খাবেন। কিন্তু কই, এরা তো

পানটান কিছু দিচ্ছে না। তিনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর মনের দুঃখ ছেড়ে ফেলে পাশের বাসায় চলে যান। সেখান থেকেও যে আরেকটা 'কল' এসে গেছে। শহরের সব খোকা-খুকুকেই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যে তার। সন্ধ্যা থেকে আসতে থাকে 'কল'। মধ্যরাত পর্যন্ত আসে। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে ছুটতে হয় বাড়ি বাড়ি। বড় ক্লান্তিকর কাজ। তার শরীর ভেঙে আসে। তাছাড়া বয়স হয়েছে, হাত-পায়ের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। আগের মতো নড়তে-চড়তে পারেন না। তবুও তিনি ঘুম পাড়ান। এ তার কপাল। এ কাজ তাকে করতেই হয়। রোজ রাতে তিনি ভাবেন, আজ থলে থেকে ঘুম বের করে দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন সব ঘুম দিয়ে দেওয়া না হয়। খানিক ঘুম যেন থাকে। ওটা তিনি রাখতে চান নিজের জন্য।

কিন্তু রাতের বেলা কাজের ঘোরে আর খেয়াল থাকে না। যতটুকুন ঘুম থলেতে থাকে, তার সবটাই ঝেড়ে-ঝুড়ে তিনি দান করে দেন। শেষে খালি ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘরে ফেরেন। ঘর মানে তো সেই পাটের গুদাম। ক্লান্ত দেহে শেষরাতে ঘরে ফিরে মাসির চোখে আর ঘুম আসে না! তিনি থলে ঝাড়েন। নাহ। এক কণা ঘুমও নেই। এদিকে বাতের ব্যথাটা বেড়ে গেছে। তিনি বক বক করতে থাকেন। 'আর যদি এই ভুল আমি করেছি! কাল সবার আগে নিজের জন্য ঘুম সরিয়ে রাখবই!'

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা বেলা আবার সব কথা ভুলে তিনি ঘুমের থলে হাতে বেরিয়ে যান। কাজের তোড়ে ভুলে যান তার নিজের কথা। রোজ রাতে এই হয়। গভীর রাতে যদি তুমি রতনপুর পাট গুদামের পাশ দিয়ে যাও, শুনতে পাবে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির গজর গজর। একদিনের ঘটনা। শীতের রাত। শীতের রাতে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির মেজাজ খুবই খারাপ থাকে। কারণ শীতের রাত হয় বড়। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা আসে। দেরি করে ভোর হয়। ফলে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিকে অনেকক্ষণ রাত জাগার কষ্ট সইতে হয়। গভীর রাতে সবে মাসিপিসি ফিরেছেন, অমনি কল চলে এলো! কে যেন ডাকছে, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো...। কে ডাকে! এত রাতে কে ডাকে! তিনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন ডাকটা কোথা থেকে আসছে। ছুটে গেলেন সঠিক বাড়িতে। গিয়ে তো তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেলো। এই পাজি বিচ্ছুটা করেছে কী! অনেক আগেই তাকে তিনি ঘুম দিয়ে গেছেন। সেই ঘুম সে কী

করেছে? এই ছেলে ঘুমায়নি কেন ? নিশ্চয় ফেলে দিয়েছে। ভারি পাজি ছেলে তো! আমি নিজে না ঘুমিয়ে তোদের ঘুম দেই, আর তোরা কিনা সেই ঘুম এভাবে ফেলে দিস। সারা রাত আমাকে কত কষ্ট করতে হয়, তোরা জানিস!

তিনি বললেন, এই ছোঁড়া, তুই ঘুমোসনি কেন ? ছেলেটা জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে শুলো। ওর মা বললো, কী বজ্জাত ছেলেরে বাবা, নিজে তো ঘুমুচ্ছেই না, অন্য কাউকেও ঘুমুতে দিচ্ছে না। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি তুমিই বলো, একে নিয়ে কী করি! এর জ্বালায় যে আর বাঁচি না। মাসিপিসি বললেন, ওর জ্বালায় তুমি বাঁচো না নাকি! তাহলে তো আমি আর সহ্য করবো না। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

মাসিপিসি বজ্জাত ছেলেটাকে একটানে তুলে নিয়ে চললেন আকাশের দিকে। ছেলে তো ভয় পেয়ে কেঁদে-কেটে একাকার। মাসি, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

মাসি ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা লম্বা গাছের ডালে। শীতের রাত। আকাশে চাঁদ। গাছের ডালে বসে দুষ্টু ছেলেটা ভয়েই বুঝি মরে যায়।

সে বললো, মাসিপিসি, ছেড়ে দাও আমাকে, প্লিজ।

মাসিপিসি গজরাচ্ছেন, আমি নিজে ঘুমানোর জন্য ঘুম পাই না, আর তুই ঘুম ফেলে দিস।

'আর কক্ষনো এমন করব না মাসি।'

ওদিকে ছেলেটার মা-বাবাও কাঁদতে লাগলো।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি আসো
খাটও আছে পালঙ্কও আছে, যেথায় খুশি বসো
আমাদের ছোট্ট ছেলে ফেরো তাকে নিয়ে
পান-সুপুরি সত্যি দেবো সাজিয়ে চুন দিয়ে

পান-সুপুরির সঙ্গে আবার চুনও। মাসিপিসি ছেলেটাকে নিয়ে ফিরলেন তার বাবা-মায়ের কাছে। ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা-মা সত্যি খুশি। তারা অনেক অনেক পান-সুপুরি চুন দিলো মাসিপিসিকে।

আর মাসিপিসি সেসব হাতে নিয়ে তার ঘরে ফিরলেন। ফেরার আগে বলে গেলেন, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম, এরপরের দিন যে আমাকে রাগাবে, তাকে কিন্তু ছাড়ব না। হ্যাঁ।

চকলেট, লজেন্স আর চুইংগাম

একটা ছিল দেশ। সেই দেশে বাস করত তিন বন্ধু। কারা?

চকলেট, লজেন্স আর চুইংগাম।

কী সেই দেশ?

একটা কৌটা। লাল রঙের কৌটা। তরমুজের যেমন বাইরেটা সবুজ, ভেতরটা লাল; কৌটার তেমনি বাইরেটা লাল, ভেতরটা সোনালি।

সেই সোনালি কৌটায় মহাসুখে আছে তিন বন্ধু। একটা চকলেট, একটা লজেন্স, আরেকটা চুইংগাম।

তিনজন একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে ঘুমায়, একসঙ্গে জাগে আর একসঙ্গে খেলে।

এদের মধ্যে লজেন্সের অহঙ্কারটা একটু বেশি। সে বলে, দেখো, আমার কাপড়টা কেমন দামি। লজেন্সের আবার কাপড় কী? কেন, ওর মোড়কটা! একটা কাগজ দিয়ে ওকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে না! স্বচ্ছ কাগজ। বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায়! তাতেই তার ডাঁট গেছে বেড়ে। সে দাবি করে, তার পোশাকটা খুবই দামি।

শুনে চুইংগাম হাসে। লজেন্সের কাপড়টা মোটেই দামি নয়। দামি হলো তারটা। কী সুন্দর রুপালি পাতে সে মোড়ানো।

লজেন্স ছড়া কাটে—

আমার কাপড় দামি
আমি হলাম নামী।

চুইংগাম জবাব দেয়—

আমার নাম চুইংগাম
চারিদিকে আমার নাম
সবাই জানে আমার দাম
আমি খুবই মূল্যবান।

চকলেট বলে, ছি! ছি! তোরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিস! শোন, নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

ঝগড়াঝাটি নয়, আয়, বরং আমরা খেলি, গান গাই আর লাফালাফি করি।

আমরা যে তিনজন
তিনজন ইষ্টি
তিনজন বন্ধু
তিনজনই মিষ্টি
একে অন্যের ঘাড়ে
অপবাদ দিস কি?
তিনজনা তিনরূপ
সে তো শুধু বাইরে
ভেতরে চিনির রস
আর কিছু নাই রে।

গান হয়। নাচ হয়। হাসাহাসি হয়। সুখ আর সুখ।

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। চুইংগামকে ভূতে কিলাতে লাগলো। সে বললো, এই তোরা একটু থাক। আমি একটু ঘুরে আসি। দেখে আসি কৌটার বাইরের দুনিয়াটা কেমন?

'যাবি?' চকলেট বলে!

'নিশ্চয় যাব। ঘরে থাকতে থাকতে শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে'– চুইংগাম বলে।

'যেতে চাচ্ছিস যা। তবে খবরদার দেরি করিসনে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। এসে বলবি, বাইরের দুনিয়াটা দেখতে কেমন।'

'আচ্ছা।'

চুইংগাম বেরিয়ে পড়লো। গিয়েই দেখতে পেলো একটা ছোট্ট ছেলে বসে আছে।

তাকে গিয়ে চুইংগাম বললো, 'ভাইয়া, কেমন আছেন ? তারপর খবর-টবর কী ?'

ছেলেটি বললো, 'আর খবর! যা দিনকাল পড়েছে! তা তুমি কেমন আছো চুইংগাম ?'

'ভালো, ভালো।'

ছেলেটি ততক্ষণে চুইংগামকে হাতে তুলে নিয়েছে। তারপর তার মোড়ক খুলে তাকে চালিয়ে দিলো সোজা মুখের ভেতর। মুখের ভেতর থেকে সে চলে গেলো পেটে।

চুইংগাম কেন আসছে না ? চকলেট আর লজেন্স তো চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। শেষে চকলেট বললো, 'লজেন্স রে, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে, চুইংগাম কোনো বিপদে পড়েছে। তুই থাক, আমি এক দৌড়ে দেখে আসি ঘটনা কী ?'

'আচ্ছা, তাই যাও ভাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো'– লজেন্স বললো।

চকলেট বাইরে এলো। দেখা পেলো সেই ছোট্ট ছেলেটির। বললো, 'ভাইয়া, আপনি কি কোনো চুইংগামকে দেখেছেন এই দিক দিয়ে যেতে!'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায় এখন সে ?'

'তুমি কি তার কাছে যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ'– চুইংগাম বললো।

অমনি ছেলেটা চকলেটকে হাতে তুলে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে তাকে চালান করে দিলো নিজের পেটে।

এদিকে লজেন্স তো একা কৌটার মধ্যে। তার কী যে খারাপ লাগছে! সে কখনো একা এই কৌটায় ছিল নাকি ? সে কাঁদতে লাগলো। প্রথমে কেবল তার চোখের পানি পড়ছিল। একটু পর শুরু হলো হাউমাউ করে কান্না– ও চকলেট ও চুইংগাম, তোরা কোথায় গেলি রে, আমার কিছু ভালো লাগছে না রে। আমাকে নিয়ে যা রে।

তার কান্না ঠিকই শুনতে পেলো ছোট ছেলেটা। সে কৌটা খুললো—বললো কী হয়েছে লজেন্স, তুমি কাঁদছো কেন ?

'আমার বন্ধুরা কোথায় হারিয়ে গেছে। তাদের জন্য আমার ভারি কান্না পাচ্ছে যে।'

'তোমার বন্ধু কারা?'

'চকলেট আর চুইংগাম।'

'আচ্ছা। তুমি কি তোমার বন্ধুদের কাছে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। তাহলে চলো।'

ছেলেটা লজেন্সের মোড়ক ছাড়িয়ে তাকে নিয়ে নিলো নিজের জিভে।

তারপর দেখা হয়ে গেলো তিন বন্ধুর। ছেলেটার পেটের মধ্যে তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদতে লাগলো। তারপর আবার শুরু হলো তাদের লুটোপুটি, খেলাধুলা, গান আর হইচই।

আমরা তিন বন্ধু
বন্ধু থাকব চিরদিনই
বাইরে দেখতে যেমন তেমন
ভেতরেতে সবার চিনি
তাই রে নাইরে তা না না না
কাউকে ছেড়ে কেউ যাব না
না না না না ....

কালরাত্রি

পুতুলের বয়স আড়াই বছর। সে পুতুলের মতোই একটা ছোট্ট সুন্দর মেয়ে। তবে বাবা বলেন, আমার মা হলো টকিং ডল। কথা-কওয়া পুতুল। পুতুল বলে, বাবা, আমার তাবি কই ? এ কথার মানে হলো, আমার চাবি কই! পুতুলের একটা পুতুল আছে, চাবি দেওয়া। চাবি ঘোরালে ওই পুতুলটা নাচতে থাকে আর দুহাত দিয়ে বাজনা বাজায়। বাবা বলেন, তোমার চাবি হলো ভাত!

'অ্যা. থি থি।' পুতুল বলে। এর মানে হলো, ছি ছি।

পুতুলের সবই ভালো, শুধু একটাই সমস্যা। সে ভাত খেতে চায় না। তার মা তাকে নানা কসরত করে খাওয়ান। যেমন আজ সন্ধ্যায় তিনি পুতুলের ছোট্ট টিনের থালাতে ভাত মেখে নিয়ে ১০টা দলা বানালেন। টিনের লাল রঙের থালা। সুন্দর ফল আর পাতার ছবি আঁকা থালা। তার ওপর ভাতের ১০টা ভাগা।

মা বললেন, 'এই এক লোকমা হলো তোমার বড় চাচার। এটা তুমি খেলে তোমার বড় চাচা খুশি হবেন। তিনি তোমাকে একটা লাল ফ্রক কিনে দিয়েছেন। নাও, খাও।'

বড় চাচার কথা ভাবতে ভাবতে পুতুল এক লোকমা ভাত খেয়ে নিলো।

এটা হলো তোমার সাথী আপুর।

পরের লোকমা ভাত পুতুলের মুখে তুলে দিতে দিতে মা বললেন। সাথী আপু পুতুলের খালাতো বোন।

এইভাবে ১০ লোকমা ভাত ১০ জনের নামে খাওয়াতে হবে। এর মধ্যে পুতুল অন্তত তিনবার বিদ্রোহ করবে।

একবার ওয়াক ওয়াক করে বমি করার ভান করবে। ভান মানে হলো অভিনয় করা। সত্যি সত্যি বমি না হলেও ওয়াক ওয়াক করলে সুফল মেলে। মা ভড়কে যান। বলেন, না থাক। আর খেতে হবে না। যা পেটে গেছে, সেটাই পেটে রাখো।

আজ পুতুল একটু ভুল করে ফেললো। প্রথম দুই লোকমা ভাত পেটে পড়তেই ওয়াক ওয়াক শব্দ তুললো। ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। মা বললেন, 'দুই গ্রাস মাত্র খেয়েই ওয়াক তুলছো! ব্যাপার কী। বমি হবে, করো তাহলে বমি। দুই দলা ভাত বেরিয়ে গেলে ক্ষতি নেই। বাকি আট ভাগ পড়েই আছে। বমি হয়ে গেলে খাওয়াবো।'

পুতুল চুপ মেরে গেলো।

মা রেগে গেলেন। বললেন, 'করো বমি। করো।'

পুতুল বললো, 'ধাল। ধাল।' মানে ঝাল।

মা বললেন, 'ঝাল কোথায়! একটা মরিচও দেইনি তরকারিতে।'

'ওই যে।' পুতুল পাতের মধ্যে একটা সবুজ কাঁচা মরিচের টুকরা আবিষ্কার করতে পেরেছে।

'উরে সোনা মানিক!' মা তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। কাঁসার গেলাশে পানি খাওয়ালেন মেয়েকে। তারপর প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, 'চিনি খাবি, মা, চিনি।'

'খাবো।' পুতুল ফিক করে হেসে ফেললো। চিনি তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ খাবার।

মা চিনির বয়াম আনলেন। একটু চিনি হাতের তালুতে নিয়ে মেয়েকে বললেন, 'নে, খা।' মেয়ে তার ছোট্ট জিভ বের করে মায়ের হাতের তালু চাটতে লাগলো। পুতুলের কয়েকটা দাঁতও আছে। তার নিচে চিনির দানা পড়ে কট্ কট্ শব্দ হচ্ছে। কী মজা।

চিনি খাওয়া হয়ে গেলে মা বললেন, 'লক্ষ্মীসোনা, বাকি ভাতটুকু খেয়ে নাও।'

'না খাবো না।' পুতুল বললো।

'পুতুল, খাও'— মা রাগী গলায় বললেন। কিন্তু পুতুলের পেটে পানি পড়েছে। চিনি পড়েছে। এখন খেতে তার সত্যি সত্যি ইচ্ছে করছে না। বড়রা

যে কেন এই ব্যাপারটা ধরতে পারে না। ইচ্ছে না করলেও কি জোর করেই খেতে হবে!

সন্ধ্যা বেলা। লক্ষ্মীবাজারের একটা ছোট্ট বাসার নিচতলার ঘর। টিম টিম করে বাতি জ্বলছে। কতোগুলো পোকা উড়ছে বাতি ঘিরে। একটা চৌকির ওপর বসে আছেন বাবা। তিনি একটা রেডিওতে খবর শোনার চেষ্টা করছেন। নিচে দুটো পিঁড়িতে চলছে মা-মেয়ের ভাত খাওয়া ও ভাত খাওয়ানোর সংগ্রাম।

পুতুল খাবে না। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে। মা তার মুখ খোলানোর চেষ্টা করছেন, পারছেন না। জোরাজুরি করতে গিয়ে মায়ের এক হাত লেগে গেলাশটা উল্টে গেলো। পানি গড়াতে লাগলো মেঝেয়। মা রেগে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় মারলেন মেয়ের গালে। পুতুল চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বাবা বললেন, 'উহ! কী যন্ত্রণা।'

রেডিওতে খবর হচ্ছে। এদের যন্ত্রণায় শুনতেও পাবো না দেখছি। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। আলোচনা ভেঙে গেছে।

শেখ সাহেব মনে হয় স্বাধীনতা ডিক্লায়ার করবে। তাই ভালো! কিসের আলোচনা। এক দফা এক দাবি—বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে গেলো বাবার কাছে। বাবা!

'কী হয়েছে পুতুল। মা মেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন পুতুলের মা। পুতুলকে মেরেছো কেন ? খবরদার। আর কখনো আমার মায়ের গায়ে হাত তুলবে না।'

মা রেগে গেলেন। বললেন, 'খুব মেয়ের সোহাগ দেখানো হচ্ছে। দেখো মেয়ে কী করেছে। এক লোকমা ভাত মুখে দেয়নি।'

পুতুল বললো, 'দুই গাল খেয়েছি। চিনি খেয়েছি। আর খাবো না।'

'আচ্ছা খেয়ো না।' বাবা আবার রেডিওর নব ঘোরাতে লাগলেন।

মা ভীষণ বকাবকি শুরু করলেন।

বললেন, 'খাও, নইলে মিলিটারি আসবে। পশ্চিমা মিলিটারি। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

মেয়ে তবুও খাবে না। সে তার চাবি দেওয়া পুতুলটাকে নিয়ে খেলতে বসলো। বলতে লাগলো, 'খাও তুলতুল। নইলে মিলিটালি আতবে। তোমাকে ধলবে।'

আজ রাতে মেয়ে আর ভাত খেলোই না। তাকে এক বোতল দুধ বানিয়ে দিলেন মা। শুয়ে শুয়ে সেই ফিডার সে খাচ্ছে।

মা তার পাশে শুয়ে। বলছেন, 'মা ভাত না খেলে কি কেউ বড় হয় ? খেতে হয় মা।'

পুতুল ফিডারের নিপল থেকে মুখ সরিয়ে বললো, 'ভাত না খেলে কি মিলিটালি আসে মা!'

'হ্যাঁ। আসে! ভয়ঙ্কর সব মিলিটারি।'

ভয়ঙ্কর সব মিলিটারির কথা ভাবতেই দুচোখ বুঁজে এলো পুতুলের। সে তলিয়ে গেলো গভীর ঘুমের ভেতরে।

কোথা থেকে কী হলো কে জানে! আড়াই বছরের ছোট্ট পুতুল। জেগে উঠলো অন্ধকার আর স্ফুলিঙ্গের আলোয়। ভয়াবহ কানে তালা দেওয়া শব্দে।

সে কিছু বুঝলো না। চোকি থেকে একা একা টুপ করে গেলো নেমে। বাইরে তখন জ্বলে যাচ্ছে সব বস্তি আর বসতবাড়ি। পুড়ে যাচ্ছে নয়াবাজার, তাঁতীবাজার, শাঁখারিপট্টি। ট্যা ট্যা গুলির শব্দ। কামানের গর্জন।

পুতুল কিছু বুঝছে না।

মেঝেতে হাঁটছে একা একা।

কাঁদতে কাঁদতে আর ভয়ে তার শরীর নীল হয়ে গেছে। জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়।

সে তার বাবা-মাকে ডাকছে। কিন্তু মা কিংবা বাবা কেউ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। কেউ তাকে কোলে তুলছে না।

দরজা খোলা।

বাইরে আগুন জ্বলছে। তার কাঁপা কাঁপা আলো এসে পড়ছে পুতুলের ঘরে।

পুতুল বলছে, মা আমি ভাত খাবো মা। মিলিটারিকে যেতে বলো। আমি ঠিক ভাত খাবো!

তার মায়ের কোনো সাড়া নেই। তার বাবার কোনো সাড়া নেই।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের দিন পেরিয়ে যে রাত্রি এসেছিল, সে রাত্রি ছিল এমনি ভয়াবহ।

পুতুলের মা-বাবা সাড়া দিয়েছিল কিনা আমরা জানি না। তবে অনেক মানুষ ওই রাত্রিতেই মারা গিয়েছিল পাকিস্তানি মিলিটারিদের গুলিতে, সেটা আমরা জানি। ইতিহাস বইয়ে সব লেখা আছে।

ভয়ে-আতঙ্কে আধখানা হয়ে যাওয়া পুতুল কাঁদছে, আর ডাকছে মা মা। কামান-গোলার গর্জন, মানুষের আর্তনাদ আহাজারির মাঝে সেই মা মা ডাক কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, কে জানে।

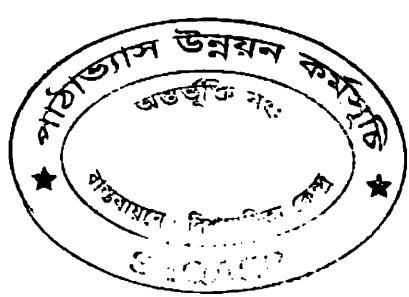

বেঁটে ভূত

সেদিন অফিসে যাবো বলে ঘর থেকে বেরিয়েছি। মিরপুরে থাকি। ওখান থেকে রোজ মিনিবাসে চড়ে সোনারগাঁর মোড়ে আসি।

বাসে আজ বেজায় ভিড়। বসার জায়গা তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গাও নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সামনের সিটের লোকটা উঠে পড়লো। একটা সিট ফাঁকা। অথচ কেউ বসছে না। সুবর্ণ সুযোগ। আমি বসে পড়লাম। বসে বসে ভাবছি, এই সিটে অন্য কেউ দৌড়ে এসে বসলো না কেন? ব্যাপার কী।

এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে, সিটে কোনো গুরুতর সমস্যা থাকে। হয়তো পায়ের কাছে বমি, নয়তো সিটটা ভাঙা, টিন বেরিয়ে আছে, ওঠার সময় প্যান্ট যাবে ছিঁড়ে। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করেও আসনটার কোনো ত্রুটি বের করতে পারলাম না।

বাসের কন্ডাক্টর এসে ভাড়া চাইলো। বুক পকেটেই ৫ টাকা আলাদা করে রেখেছি। অবশ্য বুক পকেটে টাকা রাখা ঠিক নয়।

পকেটমার সহজেই দু আঙুল চালিয়ে টাকা তুলে নিতে পারে।

কিন্তু প্যান্টের পকেটে টাকা রাখা আরো মুশকিলের ব্যাপার। না দাঁড়িয়ে টাকা বের করা যায় না। আর মিনিবাসের সিটগুলো এতো চিপা যে, একবার বসে পড়লে আর দাঁড়ানো যায় না। হাঁটু সামনের সিটের পেছনে অনড়ভাবে আটকে থাকে।

টাকা বের করতে পকেটে হাত ঢোকালাম।

পকেটে কী যেন একটা জিনিস!

টাকাটা আলাদা করে বাসের কন্ডাক্টরকে দিয়ে দিলাম। কন্ডাক্টর চলে গেলো। এবার পকেট থেকে বের করলাম ভেতরের জিনিসটা। হাতের তালুতে নিলাম!

ওমা!

এ কী!

একটা ছোট্ট পুতুল। ইঞ্চি তিন বা চারেক লম্বা হবে। দেখতে একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো লিলিপুট মানুষের মতো।

'এই পুতুলটা আবার এলো কোত্থেকে!' আমি বিড় বিড় করে বললাম।

'আমি নিজে নিজেই পকেটে ঢুকে পড়েছি'—চিকন গলায় কে যেন বললো!

'কে রে ? কথা বলে কে ?' আমি আশ্চর্য।

'আমিই কথা বলি, আপনার হাতে'— জবাব এলো।

ভালো করে তাকালাম হাতের বস্তুটার দিকে। তাইতো, এই লিলিপুটটারই তো ঠোঁট নড়ছে।

ভয়ে আমার কলজে গেলো শুকিয়ে।

'ভয় পাবেন না। আমি কোনো ভয়ের জিনিস না'— ছোট্ট পুতুলটা বললো।

'আপনি... আপনি কে ?' তোতলাতে তোতলাতে বললাম।

'আমি ? আমি হলাম ভূত।'

'ভূত ?' আমি বোধহয় ভয়ে মরেই যাবো!

'ভয় পাবেন না। আমি হলাম ভালো জাতের ভূত। আমার নাম বেঁটে ভূত।'

'ভাই বেঁটে ভূত, আপনি আমারে ধরেছেন কেন ?'

'আমি তো আপনাকে ধরি নাই, আপনার পকেটে ঢুকেছি মাত্র। সোনারগাঁ মোড়ে গিয়েই আমি নেমে যাবো।'

'সোনারগাঁ মোড়ে যাবেন কেন ?'

'ওখানে একটা ছাপাখানা আছে। ওই ছাপাখানায় একটা ভূত আছে। লম্বু ভূত। আমার মামা হয়। বহুদিন মামার সঙ্গে দেখা হয় না। তাই আজ রওনা হয়েছি।'

'মামার সঙ্গে দেখা করবেন। তা আমার সঙ্গে কী ? ভাইজান, আমি ছাপোষা মানুষ! কোনো ঝুট ঝামেলায় নাই। আমাকে ছেড়ে দেন।'

বেঁটে ভূত বললো, 'আমি আপনাকে ধরতে আসিনি। আসলে বেঁটে ভূতের অনেক অসুবিধা। আমার ছোট ছোট পা। যতো জোরেই দৌড়াই, বেশিদূরে যেতে পারি না। আবার উড়েও বেশিদূর যেতে পারি না। ১০ ফুট দূরে গিয়েই ধপাস করে পড়ে যাই। সেজন্য ভাবলাম বাসে যাবো। কিন্তু আমার বাসভাড়া নেই। মিরপুর স্টেডিয়ামের ছাদে উঠে খেয়াল করি, কে কে বাসে ওঠে। আপনাকে ফলো করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। তারপর বুঝেছি, আপনি সোনারগাঁ মোড়েই যান। তাই আজ আপনার বাসায় গিয়ে শার্টের পকেটে ঢুকে বসেছিলাম।'

বাস সোনারগাঁ মোড়ে এসে গেলো। আমি নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে ভূতটাও নামলো। সে তখন আমার পকেটে ছিল।

ছাপাখানাটার সামনে এসে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভূতটা বললো, 'আপনি কখন ফিরবেন ?'

আমি বললাম, 'দেরি হবে। আজ অফিসে অনেক কাজ। রাত ৮টার আগে তো নয়ই।'

'ঠিক আছে। রাত ৮টাতেই আপনার অফিসের সামনে আমি থাকবো। তবে কথায় যেন নড়চড় না হয়। ৮টা মানে কিন্তু ৮টাই।'

আমি ভেবেছিলাম বিকেল ৪টা-৫টার দিকেই বাসায় যাবো। বেঁটে ভূতের হাত থেকে পালাবো। কিন্তু বেঁটে ভূতের এ ডায়লগ শোনার পর আর সাহস হলো না।

৮টার সময় অফিস থেকে বেরিয়েছি।

লোডশেডিং। চারদিকে ঘন অন্ধকার। অফিস থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি। এমন সময় সামনে দেখি, একটা তালগাছের সমান উঁচু শাদা ধবধবে মানুষাকৃতির জিনিস। বুঝলাম, ইনিই হলেন লম্বু ভূত। উনি বললেন, 'হক সাহেব, আপনার ওপর আমি বেজায় খুশি। আমার ভাগ্নেকে আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। ওর আজকেই ফেরার কথা ছিল। কিন্তু মামা হয়ে ওকে এতো তাড়াতাড়ি ছাড়ি কী করে বলুন। আপনি একলাই যান। কিছু মনে করবেন না। ভূত হয়েও ও কথা রাখতে পারছে না।'

আমি তো ভয়ে কাঠ। মুখে রা নেই। লম্বু ভূতের হাতের তালুতে বেঁটে ভূত। লম্বু ভূত বললো, 'আপনাকে আমি একটা চকলেট দেবো। চকলেটটা আপনি পকেটে রাখবেন। বাসায় গিয়ে বের করবেন।'

তথাস্তু। ভূতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় এসেছি। খুব ঠাণ্ডা লাগছে। শরীর কাঁপছে। জ্বর আসবে বোধহয়। ভাত না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো দেরি করে। আগের দিনের কথা মনে পড়লো। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মনে হয়, রাতে স্বপ্ন দেখেছি। আলনায় শার্টটা ঝুলছে। পকেটে কি চকলেটটা আছে? বিছানা থেকে উঠে আলনার কাছে গিয়ে শার্টের পকেটে হাত দিলাম। একটা চকলেট আছে। এই চকলেট নিয়ে এখন কী করি। খেতে ভরসা হলো না।

রাস্তার এক টোকাইকে চকলেটটা দিয়ে দিলাম। এর পরদিন শার্ট পরতে গিয়ে দেখি পকেটে আরেকটা চকলেট। সেটাও দিলাম সোনারগাঁ মোড়ের এক ফুলওয়ালা পিচ্চিকে। একটু পরে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আরেকটা চকলেট। এখনো সেই শার্টটা আছে। এখন অবশ্য চকলেট খেতে আর ভয় পাই না। যখনই খেতে ইচ্ছে করে, পকেটে হাত দিলেই হলো। একটা চকলেট রেডিই থাকে।

আকাশ কাঁদে, আকাশ হাসে

রাতুল জোরে শ্বাস নিলো। বুক ভরে। তারপর বললো, বাবা, বাইরে বৃষ্টি শুরু হলো। দেখো, কেমন গন্ধ উঠেছে। এই গন্ধকে কী বলে, বাবা ?

'সোঁদা গন্ধ'— বাবা বললেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি গোপন করলেন। সত্যি সোঁদা গন্ধ আসছে। তপ্ত মাটিতে পড়া এই আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি। মাটিতে পড়েই ধোঁয়া মতো তুলছে। তারই গন্ধ। তিনি প্রথমে খেয়ালই করেননি। ছেলের কথায় তার হুঁশ হলো।

'কেমন শব্দ হচ্ছে, খেয়াল করেছো, বাবা ?'

'হ্যাঁ। হচ্ছে শব্দ।'

'এ ধরনের শব্দকে কী বলে ? রিমঝিম, টিপটিপ, নাকি ঝরঝর ?' রাতুল বললো।

'তুই বল।'

'ঝিঁঝি', রাতুল হাসলো। তার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। বয়স সাত হলো।

'বাবা, চলো বারান্দায় যাই। বৃষ্টি দেখি।' রাতুল বললো।

'চল।' রাতুলের বাবার বুকটা বিষাদে ভরে উঠলো।

ছেলে কেমন করে বলছে, বৃষ্টি দেখি। ও তো আসলে দেখতে পাবে না।

মাসখানেক আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওর চোখ দুটোয় সমস্যা হয়েছে। এখন দুটো চোখই ব্যান্ডেজে ঢাকা।

তবু তিনি ছেলের হাত ধরলেন। ওকে বারান্দায় নিলেন। রাতুল বারান্দার গ্রিলে হাত রাখলো। ভেজা ভেজা গ্রিল।

'থ্যাংক ইউ বাবা।'

বাবা তার পাশে দাঁড়ালেন। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধটা আর নেই।

সামনে কতগুলো কাঁঠাল গাছ। পাতাগুলো বৃষ্টির জলে গোসল সারছে। সারা বছরের ধূলি জমেছিল পাতায় পাতায়। এখন বেশ দেখাচ্ছে।

'বাবা, বৃষ্টিতে কি সবকিছু সাদা দেখাচ্ছে?'

'সাদা সাদা দেখাচ্ছে। পুরোপুরি সাদা নয়।'

'সামনের ইলেকট্রিক তারে কি কতোগুলো কাক বসে আছে?'

'কী করে বুঝলি?'

'ওমা। কা কা ডাক শুনলাম না? এই দেখো শব্দ উঠলো। একটা কাক বুঝি উড়াল দিলো?'

ছেলে সব শব্দ এখন খেয়াল করে, বাবা ভাবলেন।

'বাবা। গন্ধ পাচ্ছো? একটা কাঁঠাল বুঝি পেকেছে?'

'গাছে পাকলো, নাকি কারো ঘরে পাকলো, কে জানে?'

'বাবা, বৃষ্টিটা এখন কম, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা। গাছের পাতাগুলো কি এখন খুব সবুজ দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, আমি কি হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

রাতুল হাত বাড়িয়ে দিলো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। তার হাতে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। মুখে হাসি ফুটে উঠছে। 'বাবা, বৃষ্টি থেমে গেছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'রোদ উঠছে?'

'হ্যাঁ।'

'ইস। আকাশ বুঝি এখন ঝকঝক করছে!'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, আকাশে কি রংধনু উঠেছে?'

'না। ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।'

'উঠবে বাবা। উঠলে আমাকে বলো।'

'আচ্ছা, তুই কি আরেকটু দাঁড়াবি, নাকি ঘরে যাবি?'

'আরেকটু দাঁড়াই ?'

'আচ্ছা। দাঁড়া।'

তারা দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পর সত্যি সত্যি রংধনু উঠলো আকাশে। বারান্দার বাঁদিক থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।

'রাতুল', বাবা মুখ খুললেন, 'রংধনু উঠেছে।' কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ধরে এসেছে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। মাত্র এক মাস আগে যে ছেলেটার সব ঠিকঠাক ছিল, একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর সে কিনা ...

'বাবা, রংধনু খুব সুন্দর, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি কাঁদছো কেন ?'

'কই, কাঁদছি না তো!'

'এদিকে এসো।' রাতুল তার বাবার হাত ধরে টানলো। বাবার মাথা নিচু করালো। চোখের নিচে হাত দিলো। বললো, 'এই যে চোখের পানি।'

বাবা বললেন, 'রাতুল রাতুল, এই যে একটা বেজি। হায় হায়, ঢাকা শহরে বেজি এলো কোত্থেকে ?'

রাতুল হাসলো। তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'বাবা। আমার চোখের ব্যান্ডেজ কবে খুলবে বাবা ?'

'এই তো। সামনের মাসে অরবিস আসবে। তোর চোখটা তখন পুরোপুরিই খুলে দেয়া হবে।'

'আমি দেখতে পাবো, বাবা ?'

'নিশ্চয়। সবকিছু দেখতে পাবি। আগের মতোই।'

'সে খুব মজা হবে, না বাবা ?'

'নিশ্চয়।'

'বাবা। অরবিস কি খুব বড় এরোপ্লেন ?'

'হ্যাঁ। তাই হবে।'

'বাবা, সামনের মাসেও তো বর্ষাকাল থাকবে, না ?'

'হ্যাঁ। থাকবে!'

'বৃষ্টি হবে ?'

'হবে।'

'রংধনু উঠবে?'

'উঠবে।'

'ইস্। আমার চোখ যেদিন খুলে দেয়া হবে, সেদিন যেন বৃষ্টি হয়।'

'পাগল ছেলে...।'

'বাবা। সেই দিনটা খুব সুন্দর হবে। রংধনু উঠবে আকাশে। খুব নীল আকাশ। পাতা সব সবুজ। আর কী হবে জানো বাবা?'

'কী?'

'মা আমাকে দেখতে আসবেন।'

'সে তো আসেই মাঝে মাঝে।'

'সেদিন নীল শাড়ি পরে আসবে। আজকের আকাশের মতো নীল।'

'আচ্ছা। ফোন করে বলে দিস।'

'খুব মজা হবে বাবা সেদিন!'

'হবে।'

'বাবা। সেদিনের কথা ভাবতেই আনন্দে আমার কান্না আসছে। কিন্তু মুশকিল। আমি কাঁদতে পারছি না। চোখে যে ব্যান্ডেজ। তোমার কতো সুবিধা। ইচ্ছামতো চোখের জল ফেলছো। তাই না বাবা।'

'না। কাঁদছি না।'

'বাবা। আমার যেদিন চোখ খুলে দেবে, সেদিন আমিও কাঁদবো। খুব করে কাঁদবো। হ্যাঁ বাবা।'

'কেন রে? সেদিন কাঁদবি কেন?'

'এখন যে কাঁদতে পারছি না, তাই। তবে ওই কান্না হবে আনন্দের কান্না।'

বাবা চুপ করে রইলেন।

'কী বাবা। কাঁদবো না?'

'আচ্ছা কাঁদিস।'

'আমি কিন্তু ছাদে চলে যাবো। বৃষ্টিতে ভিজবো। বৃষ্টি আমার সব কান্না ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। ও তো আমার খুব ভালো বন্ধু। দেখো না, আমার হয়ে কেমন একবার হাসছে আর একবার কাঁদছে।'

আত্মা-রহস্য

সবাই আগেই নিষেধ করেছিল। বাড়িটা ভালো না। তোমরা নিও না।

কিন্তু বাবা কারো কথা শুনলেন না। বললেন, ঢাকা শহরে এতো সস্তায় এতো সুন্দর বাড়ি। এ আমি ছাড়ছি না। বাসা ভাড়া কী হারে বেড়েছে, একটু খোঁজ নিয়ে দেখো!

আমরা নতুন বাসায় উঠলাম। আমাদের বাসায় আমরা কেউই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না। আগের ভাড়াটেদের কে একজন এ বাসায় অপঘাতে মারা গিয়েছিল। তাতে কী হয়েছে! জন্ম-মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম।

আমরা বাসায় যেদিন বাক্সপেটরা নিয়ে উঠছি, সেদিনও পাড়ার ছেলেরা এসেছিল। বাবার সঙ্গে দেখা করেছিল। 'চাচা স্লামালেকুম! এ রকম একটা ভূতের বাড়িতে উঠছেন! সব জেনেশুনে বুঝে উঠছেন তো!'

বাবা বললেন, 'ভূত! ভূত বলে কিছু আছে নাকি!'

ছেলেরা বললো, 'তা তো আমরা জানি না। শুধু জানি, এ বাড়িতে একটা আত্মা ঘুরে বেড়ায়।'

'আত্মা ঘুরে বেড়ায়! তোমরা আত্মা দেখেছো?' বাবা বললেন।

'না। দেখিনি—' ছেলেরা বললো।

'না দেখেই বলে বেড়াচ্ছো আত্মা ঘুরে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ চাচা। আপনি কি কোনোদিন বাতাস দেখেছেন? দেখেননি। তাই বলে কি বলবেন বাতাস নেই!'

খাসা যুক্তি!

আমি একটুখানি মন খারাপ করলাম। বাবা টের পেয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, 'অন্তু। এদিকে আয়! বল, আমাদের নীতি কয়টা?'

'তিনটা'— আমি বললাম।

'কী কী ?'

'সদা সত্য কথা বলা। নিজের কাজ নিজে করা। কোনো আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস না করা।'

'গুড। এখন আয় নিজের কাজ নিজে নিজেই করি। এই মিটসেফটাকে দোতলা পর্যন্ত তুলে ফেলি। নে ধর।'

আমাদের বাসায় সদস্য সংখ্যা সাকুল্যে তিন।

বাবা, মা আর আমি। আমি পড়ি ক্লাস ফোরে।

এছাড়া আমাদের দরকার একজন কাজের বুয়া। পুরনো বুয়াকে সঙ্গে আনা যায়নি। তিনি এতোদূর আসবেন না। বাবা সকালবেলা অফিসে যান। আমি যাই স্কুলে। মা থাকবেন একা একা—সেটা একটু ভয়েরই কথা। যদিও বাড়িটার নিচতলায় ভাড়াটে থাকে। তাদের সঙ্গে আমাদের এখনো পরিচয় হয়নি।

বাড়িটা ধানমন্ডিতে। বেশ পুরনো। বড় রাস্তা থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সেই ছোট রাস্তার শেষ মাথায় এ বাড়ি। অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাড়ির চারদিকে গাছ আর গাছ। গাছের ছায়ায় ঘরদোর একটু অন্ধকার অন্ধকার হয়েই থাকে।

মা বললেন, কুটিকে নিয়ে আসি। ওরও তো এসএসসি পরীক্ষা শেষ। এখন বসে থেকে কী করবে। আমার সঙ্গে থাকুক।

কুটি হলো আমার ছোটখালা। খুব ইন্টারেস্টিং মহিলা। তার একটা রোগ আছে। হাসি রোগ। সারাক্ষণ হাসে। হাসে আর হাসায়।

মা নিচতলার ভাড়াটেদের বাসায় গেলেন। পরিচয়পর্বও সারলেন, আর সারলেন একটা টেলিফোন। নানার বাসায় ফোন গেলো। 'কুটি চলে আয়। ভারি মজা হবে।'

ওপার থেকে খালা কিছু একটা জিগ্যেস করলেন।

'মানে হলো, বাড়িটায় নাকি আত্মা ঘুরঘুর করে! লোকজন ভয় দেখাচ্ছে। তুই চলে আয়! একা একা দিনের বেলা আমি থাকতে পারবো না।'

ওপার থেকে খালার কিছু একটা প্রশ্ন। 'ভালো আত্মা না মন্দ আত্মা আমি কী করে বলবো ?' মা জবাব দিলেন।

আমি মা'র ফোনের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনলাম খালা বলছেন, 'জানতে হবে বুবু। খারাপ আত্মা হলে ভয়াবহ ব্যাপার। ধরো আমি বাথরুমে ঢুকেছি গোসল সারতে, এমন সময় আত্মা এসে বললো, নাজু, তুমি খুব সুন্দর। তো তখন!'

'চড় খাবি কুটি!'

'খালি খালি চড় খেতে পারবো না! একটু লবণ-মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিও।'

কুটি খালা চলে এলেন। এসেই আমাকে বললেন, 'অন্তু কী রে, তোর নাকের নিচে গোঁফের রেখা কেন! হি হি হি।'

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। বললাম, 'খালা, অসভ্য কথা বলো না।'

'কেন ? মিথ্যা বলেছি নাকি! তোদের বাপ-বেটার না জীবন-দর্শন সদা সত্য কথা বলা।'

'সত্য কথা বলতে হবে! কিন্তু বাজে কথা বলা যাবে না।'

'ও আচ্ছা! আয়! এক কাজ করি! রাতে তোর বাবাকে ভয় দেখাই।'

'না না। বাজে কাজও করা যাবে না।'

বাজে কাজ করতে হলো না। রাতের বেলা খালা নিজেই ভয় পেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে হুলস্থুল বাধিয়ে বসলেন। ব্যাপার কিছুই না। আমার পেন্সিলবাক্সে একটা টিকটিকি আছে। ইস্টার্ন প্লাজা থেকে সস্তায় টিকটিকি, গুবরে পোকা ইত্যাদির একটা প্যাকেট কিনেছিলাম। কুটি খালা পেন্সিলবাক্সটা খুলেই 'ও বাবারে' বলে এক চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তাই নিয়ে বাসার সবাই কী একচোট হাসিই না হাসলো!

তারপর সবাই গেলো ঘুমুতে। বাবা-মা এক ঘরে। আমি আর কুটি খালা আরেক ঘরে।

কিন্তু সকালবেলা উঠে সবাই অবাক। ঘরের জিনিসপত্র অগোছালো পড়েছিল। কে যেন রাতের বেলা সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে।

ড্রয়িংরুমের সোফার ফোমে কভার লাগানো ছিল না। কিন্তু সকালবেলায় দেখা গেলো, ফোমগুলোয় কভার লাগানো!

'কী ব্যাপার, সোফার কভার কে লাগালো ?' মা বললেন।

কেউ কোনো জবাব দিতে পারলো না।

পরদিন দেখা গেলো আরেক সমস্যা। বাবার ড্রয়ারের কাগজপত্র সব ছড়ানো-ছিটানো। ব্যাংকের চেকবই বাথরুমের বেসিনে পড়ে আছে!

আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। ঘটনা কী! বাবা বললেন, এ নিশ্চয়ই কুটির কাজ! কুটি দুষ্টুমি করে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে।

কুটিখালা প্রথম রাতের পর খুব হাসছিল। কিন্তু বাবার চেকবই বেসিনে পড়ে থাকতে দেখে সে গম্ভীর হয়ে গেলো!

আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলো। বললো, 'অন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। প্রথম রাতে আমিই সোফার কভার লাগিয়েছিলাম! কিন্তু দ্বিতীয় রাতে তো আমি উঠিনি। তোর বাবা-মার ঘরে রাতে আমি যাবো কেন?'

আমি বললাম, 'খালা। সত্য কথা বলো।'

'আরে গাধা, সত্য কথাই তো বলছি।'

তৃতীয় দিন হয়ে গেলো সর্বনাশ। কে যেন বাবার ডায়রিতে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে রেখেছে—'হাসান জামান সাহেব, এই বাসা ছাড়ুন।'

ব্যাপার কী! ঘটনা কে ঘটাচ্ছে! আমি চিন্তিত। বাবাকে বললাম, 'বাবা কুটি খালাকে নানুবাড়িতে রেখে আসো। তারপর যদি দেখি এমন ঘটছে...।

তাই করা হলো। কুটি খালাকে বিদায় দেয়া হলো।

কুটি খালা খুব রাগ করলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'অন্তু রে, অকারণে তোরা আমাকে সন্দেহ করলি। হাসিঠাট্টার এই ফল। দেখিস আর কোনোদিন আমি হাসবো না।'

তার পরের রাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। কিন্ত একরাত পর আবার...

ঘরদোর, আসবাবপত্র সব এদিক-ওদিক হয়ে রইলো।

মা বললেন, 'ওগো চলো, আমরা এ বাসা ছেড়ে দিই।'

বাবা বললেন, 'না। আমি আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস করি না। আমি এ বাসা ছাড়বো না।'

আজ আমি জেগে আছি। আজ রাতে আত্মা-রহস্য ভেদ করবোই। দিনের বেলা অনেকটা ঘুমিয়ে নিয়েছি যাতে রাতে ঘুম না আসে।

রাতে একজন সঙ্গী পেলে ভালো হতো। কিন্তু তা পাওয়ার উপায় নেই। মাকে রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। তার হৃদরোগ আছে।

রাত্রি ১টা কি ২টা হবে! ড্রয়িংরুমে খটখট আওয়াজ হচ্ছে। বিছানা ছাড়লাম। ঘরের বাতি জ্বালালাম।

ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখতে পেলাম বাবাকে।

'বাবা।' আমি বললাম।

বাবা আমার কথা যেন শুনতে পাচ্ছেন না। তিনি সোফার কভারগুলো সব খুলছেন।

'বাবা...।' খুব জোরে ডাকলাম।

না, বাবা কোনো কথাই শুনছেন না।

আমি দৌড়ে গেলাম মার কাছে। 'মা, মা, ওঠো, বাবা যেন কেমন করছেন!'

মা উঠলেন। ড্রয়িংরুমে গেলেন। বাবা ততোক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনিং রুমে গেছেন। এক গ্লাস পানি খেলেন তিনি।

তারপর চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পরদিন বাবাকে ধরলাম মা আর আমি। 'রাতে তুমি কী করছিলে?'

বাবা সবকিছু অস্বীকার করলেন।

আমি বললাম, 'বাবা, সদা সত্য কথা বলতে হয়।'

বাবা বললেন, 'আমি তো সত্যই বলছি অন্তু।'

বাবার সমস্যাটা বড় মামাকে জানানো হলো। তিনি একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগ চিকিৎসক। সব শুনে মামা বললেন, এটা হলো ঘুমের মধ্যে হাঁটা। ঘুমের মধ্যে কাজ করা।

মা বললেন, ভাইজান, ওকে কি আত্মায় ধরেছে!

'আরে না। আত্মা-টাত্মা আবার কী! মনে হয় ওর অফিসে কোনো সমস্যা হয়েছে। পাঠিয়ে দে আমার কাছে।'

'ভাইজান। অন্তুর বাবা ঠিক হবে তো?'

'হবে। হবে।'

মামার চিকিৎসায় বাবা ভালো হয়ে গেছেন। আর রাতের বেলা হাঁটেন না। একা একা কাজকর্ম করে সব ওলট-পালট করে দেন না। মামা বলেছেন, আসলে আত্মার ভয়, নাজুর সোফার কভার পরানো—এ সবকিছুই অন্তুর বাবার মনে ক্রিয়া করেছে। তার ওপর ওর অফিসেও একটা সমস্যা চলছিল। সব মিলিয়ে ওর মধ্যে স্লিপ ওয়াকারের লক্ষণ দেখা যায়। তবে চিন্তা নেই। এখন ও পুরোপুরি সুস্থ।

এক যে ছিল ডিম

একটা ডিম হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে। কী জানি, তার কিসের তাড়া! কিসের ভয়!

ডিম ডিমা ডিম ডিম
ছোট্ট গোল ডিম
ছুটছে দিরিম দিরিম

তার এই ছুটে চলায় বাতাসে শব্দ উঠেছে সাঁই সাঁই। পথের ধারের সবার কানখাড়া। অমন করে ছুটে যায় কে!

সবার আগে শব্দ শুনতে পায় কুকুর। সে লেজটা তুলে কানদুটো টান টান করে বলে—ভয় পাবার কিছু নেই। সামান্য ঘটনা।

বিড়াল ছিল খানিক দূরে। কুকুরের কথায় তার বিশ্বাস নেই। সে এক লাফে গিয়ে ওঠে পাঁচিলের ওপর।

একটু পরই দেখা যায় ডিমটাকে।

কী হয়েছে ভাই, তুমি অমন করে ছুটছ কেন ? বিড়াল শুধায়, কুকুর শুধায়।

একটা কাক মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে থাকে—কা কা। তাদের সবার বড় লোভ ডিমটার ওপর! আহা, যদি ডিমটাকে খেয়ে নেয়া যেত!

ডিম তাদের দেখে ভয় পায়। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছুটতে থাকে আরও জোরে!

এমন সময় বেড়ার ওপর দুই পায় দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে কক্কক বলে ডেকে ওঠে মুরগি। নাম তার লালটি বেগম। একটা ডিম ছুটছে দেখে তার বড় কষ্ট হয়। সে বেড়া থেকে নামে। পথের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়।

'ও ডিম, তুমি কার বাছা গো, অমন করে ছুটছ কেন ?' লালটি বেগমকে দেখে ডিমটা দাঁড়ায়। করুণ গলায় বলে, 'আমার খুব বিপদ।'

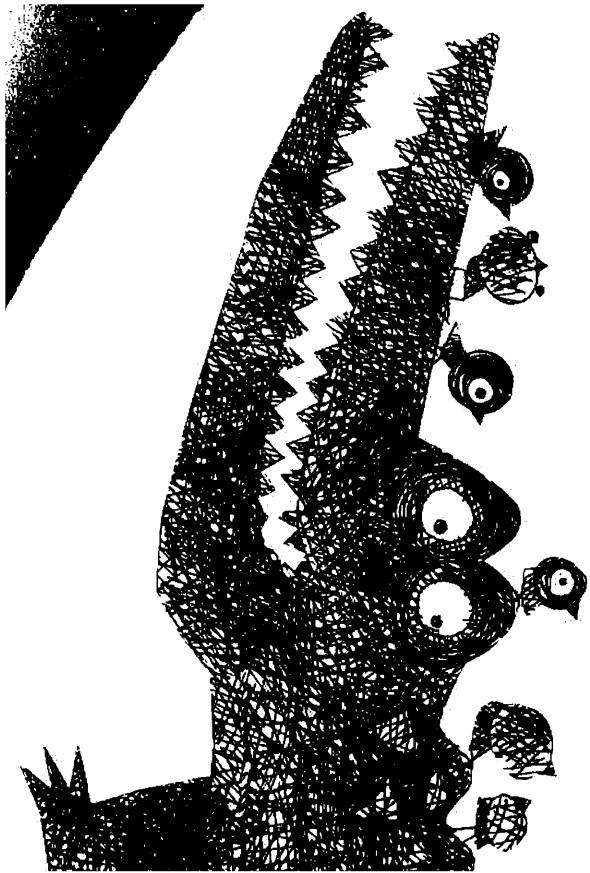

'বিপদ। তোমার বিপদ। কী বিপদ গো তোমার!' মুরগি বলে।

'আর বলো না। একটা লোক আমাকে ভেজে খেতে চায়। তার হাত থেকে ছুটেই আমি দিয়েছি এক দৌড়। লোকটা আমাকে ধরার জন্য ওই এলো বলে।'

'সর্বনাশ, ডিম হয়ে যখন জন্মেছ, তখন ডিমভাজা বা ডিমপোচ হয়ে যাওয়ার ভয় তো থাকবেই।'

'না। আমি মামলেট ওমলেট হাফ বয়েল ফুল বয়েল কিছুই হতে চাই না।'

'তা হলে তুমি কী হতে চাও?' মুরগি বলে।

'আমি চাই আমাকে তা দেয়া হোক। আমার খোসার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসুক ছানা।' ডিম জবাব দেয়। শুনে লালটি বেগমের চোখ ছলছল করে। তুমি কোন মায়ের বুক না জানি খালি করে এসেছ! চলো তবে আমার সঙ্গে।

মুরগি তাকে নিয়ে যায় নিজের ডেরায়। সেখানে তার ১২টা ডিম জমেছে। তার সঙ্গে এই ডিমটাকেও সে যত্ন করে রাখে।

তার পর শুরু করে তা দেয়ার পালা।

একদিন দু'দিন তিন দিন। ১৮ দিন পর ১২টা ডিম থেকে মুরগিছানা বেরোয়। শুধু এ পালিয়ে আসা ডিম থেকে কিছুই বেরোয় না।

লালটি বেগম তখন চিন্তিত হয়ে পড়ে। একে ওকে ডাকে। মুরগিসমাজে ফুটকি বেগম পরিচিত ডাক্তার হিসাবে। তাকে খবর দেয়।

ডাঃ ফুটকি বেগম বলে, হুম। শুধু শরীরের তাপে হবে না, একে চুলোর পাড়ে রাখতে হবে।

রাতের বেলা চুপি চুপি চুলোর পাড়ের গরমে রেখে তাকে তা দেয় লালটি বেগম।

অবশেষে ডিমটা ফাটে। ভেতর থেকে এ কী বেরিয়ে এলো?

অন্য সব মুরগি ভয় পেয়ে যায়! বলে, লালটি বেগম, তুই তা দিয়ে এ কিসের ছানা বের করলিরে! এ তো মুরগির ছানা নয়। কোন দৈত্য-দানোর ছানা।

লালটি বেগম বলে, কী যে বলো না তোমরা। এ তো আমার ছোট্ট ছেলেটি। কে বলেছে এ দৈত্য-দানো।

দিব্যি দেখতে মোরগের মতো।

লালটি বেগমের মায়ের অন্তর। অন্য সব মুরগিছানার সঙ্গে এ অদ্ভুত ছানাটাকেও সে আদর যত্ন করে বড় করতে থাকে।

ক'দিন পর সব বোঝা যায়। এ অদ্ভুত ছানাটা আসলে একটা কুমিরছানা। তাহলে একটা কুমিরের ডিম এভাবে পালিয়ে আসছিল! হায় হায়!

সবাই শুনে যা—
কোত্থেকে এক বেরুলো ডিম
মুরগি দিলো তা
ক'দিন পরে বেরুলো এক
জল-কুমিরের ছা
ও বাবারে মা!

যেই শোনে, সেই পালিয়ে যায়। ভয় পায়! হায়! হায়! কী সর্বনাশ। মুরগির ঘরে কুমিরের ছা। কী হবে গো এখন।

মুরগিসমাজে বিচারসভা বসে। সবাই ডাকে লালটি বেগমকে। বলে, ও লালটি। ওই কুমির ছানাকে তুই তাড়িয়ে দে। নইলে আরেকটু বড় হলে ও তো তোর সব ছানাকে খেয়ে ফেলবেই, তোকেও খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু লালটি বেগম কারো কথাতেই কান দেয় না।

কুমিরছানার সে নাম দিয়েছে চারপেয়ে। চারপেয়ে তার নিজের সন্তানের মতো। তাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

আস্তে আস্তে চারপেয়ে বড় হতে থাকে। তার চোখ ফোটে। লেজে জোর হয়। পায়ে শক্তি হয়। সে হাঁটে। মুরগিছানা ভাইবোনদের সঙ্গে খেলে।

আরও একটু বড় হলে সে বুঝতে পারে, সে ঠিক মুরগিসমাজের লোক নয়। আর ঠিক খুদ-কুঁড়ো খেয়েও তার পেট ভরে না। তার খাই অনেক বেশি।

ততদিনে তার ভাইবোন মুরগিছানারাও বড় হয়ে গেছে। তারাও আর কেউ মুরগিমায়ের পিছন পিছন ঘোরে না। চারপেয়ের সঙ্গেও তারা মেশে না। চারপেয়ে একা একা ঘোরে।

এমন নাদুসনুদুস একটা কুমিরছানা ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়াবে, তা হতে দেয়া যায় না। মুরগিসমাজ আবার বৈঠকে বসে। ঠিক হয় লালটি বেগমকেই সবাই তাড়িয়ে দেবে। চারপেয়ে সব কথা শুনতে পায়। সে লালটি বেগমকে বলে, মা, আমার তো আর ডাঙায় ভালো লাগে না। আমি হলাম পানির জীব। মা, আমাকে বিদায় দাও। আমি নদীতে যেতে চাই।

লালটি বেগম কাঁদে। তুই কেনই বা এলি, কেনই বা চলে যেতে চাস। আচ্ছা, যা। বড় হলে কেইবা মায়ের কাছে থাকে?

চারপেয়ে হাঁটে। লালটি বেগম তার পাশাপাশি যায়। তারপর দূরে দেখা যায় নদী। চারপেয়ে বলে, মা, এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমাকে আর যেতে হবে না।

লালটি বেগম কাঁদতে কাঁদতে তার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।

কুমিরছানা জলে নেমে যায়।

তারপর একদিন লালটি বেগম তার সব ছানাকে ডেকে বলে, চলো, আজ আমরা বেড়াতে যাবো নদীর ওই পাড়ে!

'তা কী করে সম্ভব ? কে আমাদের নদী পার করে দেবে!'

'কেন। চারপেয়ে আছে না ?' লালটি বেগম বলে।

হুররে। কী মজা!

লালটি বেগম তার ছানাপোনাদের নিয়ে যায় নদীর ধারে। চারপেয়ে তাদের দেখে নদীর চরায় উঠে পড়ে। সব মুরগি গিয়ে চড়ে বসে চারপেয়ের পিঠে।

খুব মজা করে মুরগিছানারা। কুমিরের পিঠে নদীপথে ভ্রমণ—তার আনন্দই আলাদা। ঠিক যেন পিকনিক। দিনের শেষে মুরগিরা সবাই ফিরে আসে ঘরে।

কুমিরছানা নেমে যায় নদীর পানির গভীরে।

রাতের বেলা লালটি বেগমের ঘুম ভেঙে যায়।

'চারপেয়ে' 'চারপেয়ে' বলে সে কাঁদে।

আর চারপেয়ে! সেও নদীর চরায় উঠে পড়ে প্রায়ই।

তার চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল ঝরে। সবাই বলে, ও হলো কুম্ভীরাশ্রু। আসলে তো ওই অশ্রু হলো মুরগিমায়ের জন্য তার কান্না। এ কথা কেউ বুঝতে চায় না।

জয় ফড়িং জাতির জয়

এক ছিল দুষ্টু ছেলে। তার নাম পিন্টু। বয়স তিন কি চার। মা-বাবার কথা শুনত না, ঠিক সময়ে খেতে চাইত না, খাওয়ার আগে হাত ধুত না। এমন করলে কি আর স্বাস্থ্য ভালো থাকে ? পিন্টু শুকিয়ে একেবারে পাটকাঠির মতো হাল্কা হয়ে গেলো! তার বন্ধুরা তাকে বলত, 'এই পিন্টু, তুই এতো শুকনা কেন রে ?'

'বারে, আমি বুঝি সারাক্ষণ ভেজা থাকবো!' পিন্টু জবাব দিত। পিন্টুর বন্ধুরা তাকে ডাকতে শুরু করলো তালপাতার সেপাই বলে। এক মামা অবশ্য তাকে ডাকতেন বাতাসী বাদশা বলে।

পিন্টুর মাথায় সারাক্ষণ গিজগিজ করত দুষ্টুমি বুদ্ধি। একদিন তার কী মনে হলো, সে ঠিক করলো, ফড়িং ধরবে! বাড়ির সামনেই ছিল এক বিল। বিলের ধারে বিষকাটালির ঝোপ। ওখানে যেন ফড়িঙের মেলা বসেছে। একটা পাটকাঠির ডগায় পিন্টু লাগালো জিগার আঠা। তারপর পাটকাঠিটা পুঁতে রাখলো বিলের ধারে। একটু দূরে হিজলগাছের আড়ালে সে বসে রইলো ওত পেতে। হাতে একটা নাইলনের সুতা। এই সুতাটা সে যোগাড় করেছে বিলে পেতে রাখা বড়শি থেকে। কে যেন বোয়াল মাছ ধরার জন্য শক্ত সুতা দিয়ে বড়শি পেতে রেখেছিল। পিন্টু সেই বড়শির সুতা স্রেফ মেরে দিলো। বসন্তকাল। আকাশ ঘন নীল। একখণ্ড দুখণ্ড সাদা মেঘ ভাসছে ভেলার মতো। চমৎকার আলোয় বিলের চারপাশ রাঙা হয়ে আছে। হিজলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে পিন্টু। কখন যে একটা ফড়িং বসবে তার ফাঁদের ওপর? সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ফড়িং গিয়ে বসলো পাটকাঠির ওপরে। জিগার আঠায় তার শরীর গেলো আটকে! দৌড় দৌড়! সুতা হাতে ছুটলো পিন্টু। ফড়িঙের লেজে বাঁধলো সুতার একটা মাথা।

আরেক মাথা সে বেঁধে নিলো নিজের ডান হাতের কব্জিতে। তারপর আঠা থেকে উদ্ধার করে ফড়িংটাকে দিলো আকাশে ছেড়ে।

ফড়িংটা দেখতে খুব সুন্দর। এমন লাল-হলুদ-কমলায় মেশানো তার পাখা। আবার মাথার কাছটায় খানিক কালো রঙের প্রলেপ।

নীল আকাশে ফড়িং উড়ছে! কিন্তু কতোদূর উড়বে। তার লেজ যে বাঁধা!

ফড়িংটার তখন খুব মনে পড়তে লাগলো তার বাবা-মায়ের কথা। সে এখন ফিরে যেতে চায় তাদের কাছে। কিন্তু কীভাবে যাবে, সে যে বন্দি। এদিকে পিন্টুর বাবা যাচ্ছিলেন ওই পথ দিয়ে। তিনি বললেন, এই পিন্টু, ফড়িংটাকে বেঁধে রেখেছিস কেন ? ওর যে ব্যথা লাগছে। ছেড়ে দে।

পিন্টু খিল খিল করে হাসতে লাগলো!

বাবা রেগে বাড়ি চলে গেলেন।

ফড়িংটার লেজে খুব ব্যথা লাগছে। সে বেদনায় কাঁদতে লাগলো।

তার কান্না শুনে চারদিকের সব ফড়িং এসে ভিড় করলো বিলের ধারে।

আমাদের বন্ধু ফুট্টু ধরা পড়েছে এক দুষ্টু ছেলের হাতে! তার খুব ব্যথা লাগছে! আমরা এখন কী করবো ?

ফুট্টু ফড়িং 'ও বাবা ও মা' বলে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলো। তাই শুনে ফড়িংরা সব আহা উহু করতে লাগলো। পিন্টুর বন্ধুরা এসে ঘিরে ধরলো পিন্টুকে। সবাই বললো, এই পিন্টু, ওই সুন্দর ফড়িংটাকে ব্যথা দিচ্ছিস কেন ? ছেড়ে দে।

পিন্টু বললো, না, ছেড়ে দেওয়ার জন্য ধরেছি নাকি!

ফড়িংরা সব প্রমাদ গুনলো। এই দস্যিটা তো ফুট্টুকে ছাড়বে না!

তখন সব ফড়িং মিলে বসলো মিটিঙে। আমাদের ফুট্টু বন্দি। আমাদের ফুট্টু পরাধীন। এবার আমাদের কী করা উচিত ? ফুট্টুকে মুক্ত করতে হবে।

তা কেমন করে সম্ভব ? খুব শক্ত সুতা দিয়ে যে ফুট্টু বাঁধা।

সবাইকে এক হতে হবে। ফড়িংদের নেতা বললেন। চারদিকের সব ফড়িংকে খবর দাও।

চারদিক থেকে আরো আরো ফড়িং এসে গেলো। কী করা হবে, ঠিক করা হলো গোপনে। তারপর সবগুলো ফড়িং একযোগে গিয়ে সুতার পুরোটা কামড়ে ধরলো! যে সুতায় জায়গা পেলো না, সে কামড়ে ধরলো অন্য ফড়িঙের লেজ।

বাকিরা গিয়ে বসলো পিন্টুর সারা শরীরে। তারপর, নেতা ফড়িং বলেন, রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি...।

সবাই মিলে আরম্ভ করলো উড়তে। আরে আরে, দেখো, পিন্টু অকাশে উড়ে যাচ্ছে।

তার ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা সুতা। সেখানে কী যে ব্যথা লাগছে।

পিন্টু বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার হাতে ব্যথা লাগছে। ফড়িংরা বললো, আমাদের ফুট্টুরও তো লেজে ব্যথা লেগেছিল।

পিন্টুকে ফড়িংরা নিয়ে গেলো মেঘের ওপরে। তারপর সবাই মিলে তার সঙ্গে ছেলেধরা ছেলেধরা খেলতে লাগলো। খেলাটার নিয়ম হলো : সুতা একটু ঢিলা করলেই পিন্টু নিচের দিকে পড়ে যায়। তখন সবাই মিলে দেয় হ্যাঁচকা টান। আবার পিন্টু ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

পিন্টু বললো, সে কি! তোমরা আমার সঙ্গে এমন করছো কেন?

ফড়িংরা বললো, তুমিও তো আমাদের সঙ্গে এ রকমই করেছিলে।

পিন্টু বুঝলো, সত্যি তো! ফড়িংটা ধরে তো সে একইরকম খেলাই খেলেছিল। তখন পিন্টু বললো, ভাই, আমাকে মাটিতে নামিয়ে দাও। আমি সারেন্ডার করছি! ফড়িংরা বললো, সারেন্ডার মানে কী!

পিন্টু বললো, আত্মসমর্পণ। হার মেনে নিচ্ছি।

তখন ফড়িংরা তাকে নামিয়ে দিলো মাটিতে। পিন্টু খুলে দিলো ফুট্টুর লেজের বাঁধন।

স্বাধীন হয়ে গেলো ফুট্টু ফড়িং।

ফড়িংরা সবাই স্লোগান দিতে লাগলো, জয় ফড়িং জাতির জয়।

কাগজকে চিনি বানানোর মন্ত্র

টিফিন-পিরিয়ডের পর সবে ক্লাস বসেছে। সমাজবিজ্ঞান স্যার নিজামুদ্দিন ক্লাসরুমে ঢুকতেই সমস্ত ক্লাস নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। কারণ গ্রীষ্মের ছুটির পর আজই স্যারের সঙ্গে পয়লা মোলাকাত হচ্ছে। স্যার ভূগোল, পৌরনীতি আর ইতিহাস অংশ থেকে প্রথম ১৬ পৃষ্ঠা করে বন্ধের পড়া দিয়েছেন। এখন পড়া ধরা হবে। ছাত্রদের মনে ক্ষীণ আশা, যদি স্যার পড়ার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘটনা তেমন ঘটলো না। স্যার বললেন, তিন ষোলো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা যাদের ঠোঁটস্থ হয়েছে, তারা বস। আর যারা পড়া করে আসিস নি, তারা দাঁড়িয়ে থাক। জয়নাল, তুই যা, ভালো দেখে একটা বেত জোগাড় করে আন। জয়নাল হলো গিয়ে ক্লাস-ক্যাপ্টেন। বেত জোগাড় করার কাজে সে ওস্তাদ। স্কুলের বাগানেই চমৎকার কিছু ফুলের ঝাড় আছে, সেগুলো ফুলের সৌন্দর্য আর সুবাসের জন্যে যতটা বিখ্যাত, তারও চেয়ে বেশি বিখ্যাত অসাধারণ বেতের জন্যে। ছিপছিপে সোজা লম্বা ডাল, কিন্তু ভাঙে না। মেরে স্যারেরা খুব জুত পান।

মন্টু পড়া করে আসে নি। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বসাটা উচিত হবে কিনা। কারণ এমন হতে পারে, যারা পড়া শিখে আসে নি, তাদের কৃতকর্মের জন্যে কেবল দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তিই বরাদ্দ হলো, কিন্তু যারা শিখে এসেছে দাবি করে বসে পড়লো, তারা যদি পড়া না পারে, তবে তাদের পিঠে বেত চলতে থাকলো। যতক্ষণ বেত ভেঙে না যাচ্ছে ততক্ষণ চললো বেত মারা।

তবে স্যার মন্টুকে পড়া ধরবেন কিনা, এটা বলা মুশকিল। এমনও হতে পারে, স্যার আজ পড়া ধরলেনই না। বরং যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাছার ছাল তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে ক্ষেত্রে বসে পড়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

হেলাল ছেলেটাও বসে পড়েছে। হেলাল হলো ক্লাসের সুন্দর গাধা। গাল দুটো মেয়েদের মতো ফর্সা আর টোল খাওয়া, কিন্তু মাথায় এক ছটাক পরিমাণ বুদ্ধি নেই। এমন কি যে-কোনো মনুষ্যপালিত গাধাও হেলালের চেয়ে বেশি পরিমাণ মগজ মাথায় ধারণ করে। ৪৮ পৃষ্ঠা পড়া সে মুখস্থ তো মুখস্থ একবারে ঠোঁটস্থ করে এসেছে, এটা ঘটা অসম্ভব। অথচ সেই কিনা বসে পড়লো। মন্টুও কি তবে বসে পড়বে ? মন্টু দোটানায় পড়ে গেলো। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হয় খুব তাড়াতাড়ি, দেরি করে ফেললেই স্যারের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অগত্যা সে দাঁড়িয়েই রইলো। জয়নাল বেত নিয়ে চলে এসেছে। এই বেতকে বলা হয় পেন্টি ওরফে পান্টি। এটা দিয়ে রাখালরা গরু চরায় এবং অবাধ্য গরুর পিঠের বারোটা বাজায়। স্যার বললেন, জয়নাল, এ গরু-মারা পেন্টি কোথা থেকে নিয়ে এলি রে ?

জয়নাল বললো, মাঠে ছেলেরা গরু চরাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে এলাম স্যার। বলেছি ছুটির পর দিয়ে দেবো।

'যদি ভেঙে যায় ?'

'ভাঙবে না স্যার। ভাঙলে গরুর পিঠেই ভাঙত'।

'গরুর পিঠে না ভাঙলেও গাধাদের পিঠে তো ভাঙতে পারে, কী বলিস ?'

'জি স্যার'— জয়নাল মাথা নাড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর গাধা হেলাল উঠে দাঁড়ালো। বসে থাকাটা তার কাছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে বোধ হলো নিশ্চয়।

মন্টুর পিঠটা শিরশির করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ইয়া নফসি পড়া শুরু করলো সে।

স্যার বললেন, আজ যারা দাঁড়িয়ে আছিস, তাদের উপর দিয়েই চালাব। যারা বসে পড়েছিস, তাদের পরীক্ষা আগামী সপ্তাহে।

এমন সময় পিয়ন আলিমুদ্দি একটা খাতা হাতে হাজির হলেন। স্যার বললেন, কী আলিমুদ্দি, কী খবর ?

আলিমুদ্দি বললেন, খুশির খবর স্যার। জাদুর নোটিশ।

স্যার নোটিশটা পড়লেন। তারপর বললেন, এই হেড স্যার সবাইকে বটগাছতলায় যেতে বলেছেন, এখনই।

বাইরে অন্য ক্লাসের ছেলেরা লাইন ধরে বটগাছের নিচে যাচ্ছে। তারই মৃদু কোলাহল কানে আসছে।

মন্টু মনে মনে বললো, এটা হলো ইয়া নফসি পড়ার ফল।

স্যার লাঠি উঁচিয়ে বললেন, চল সবাই, লাইন ধরে চল।

জয়নাল খুব হতাশ হলো। বললো, স্যার আজকে আর মারবেন না স্যার ?

'নাহ। দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে।'

মন্টু মনে মনে বললো, জয়নাল ছেলেটাকে একদিন আচ্ছা মতো বানাতে হবে। ক্যাপ্টেনগিরি বের করে দিতে হবে।

স্কুলের সামনে আছে এক বিরাট বটগাছ। সে বটগাছের নিচে সব সভাটভা হয়। যেমন কিছুদিন আগে হলো অঙ্কের স্যার সিরাজুল ইসলামের বিদায় অনুষ্ঠান। ক্লাস নাইনের ফার্স্টবয় জুয়েল তাতে মানপত্র পড়েছিল। আর একজন ছাত্র (বড় ক্লাসের) আবৃত্তি করেছিল রবিঠাকুরের 'যেতে নাহি দেব' কবিতা। আজ স্যারের নির্দেশে মন্টুদের ক্লাস সিক্সের ছেলেরাও সব লাইন বেঁধে চলে এলো বটগাছের নিচে।

বটগাছের গোড়ায় চারটা জলচৌকি পেতে একটা মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চের একপাশে স্যারদের জন্যে চেয়ার পাতা। সামনের দিকে বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা বসে পড়েছে।

বটগাছের নিচে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটা প্রধান সুবিধা হলো গাছের নিচটা বেশ ঠাণ্ডা। বাংলার স্যার ফজলুর রহমানের ভাষায়, 'জায়গাটা ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়। নির্মল বাতাস এখানে পাওয়া যায়।' তবে মন্টু মনে করে, বাতাসটা নির্মল নয়। বরং মলযুক্ত। মল মানে হলো পায়খানা। বটগাছের ডালে সারাক্ষণ নানা পাখি কিচিরমিচির করে। এবং তারা প্রাকৃতিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করে। সে সব আবার ঠিক নিচে বসে থাকা ছাত্রদের মাথাতেই পড়ে। এ ক্ষেত্রেও ঝামেলা কম। কারণ পাখিরা সারাক্ষণ বটের লাল লাল গোল গোল ফল খায়। আর যা ত্যাগ করে তাও ফল বই অন্য কিছু নয়। এই কারণে বটগাছের বীজ দালানকোঠার উপরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে প্রায়ই দেখা যায়, বাড়িঘরের ছাদে, খিলানে বট-অশ্বত্থ নানা গাছের চারা গজিয়ে উঠেছে।

হেড স্যার মাইকে জোরে ফু দিলেন। ছাত্রদের গুঞ্জন থেমে গেলো। স্যার বলতে লাগলেন, বয়েজ, আজ তোমাদের সামনে এসেছেন এক গুণী মানুষ,

মজার মানুষ। ম্যাজিশিয়ান আব্দুল মালেক। তিনি এখন তোমাদের জাদু দেখাবেন।

জাদু! মন্টুর মনটা খুশিতে লাফিয়ে উঠলো যেন। সে হাততালি দিতে লাগলো।

ক্লাস-ক্যাপ্টেন জয়নাল বললো, এই মন্টু তুই হাততালি দিচ্ছিস কেন ? জয়নাল স্যারকে বলে দেব, গরুমারা বেতটা তোর পিঠে ভাঙবে।

মন্টু একটু বিব্রত হলো। মনে মনে বললো, জয়নালের হাড্ডি পয়মাল করার কাজটা শিগগিরই না করলে নয় দেখছি।

এমন সময় হেড স্যার বললেন, এই এত মজার একটা ঘোষণা শুনেও তোমরা চুপ করে আছো কেন, হাততালি দাও, হাততালি দাও।

মন্টু জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগলো। তার সঙ্গে অন্যরাও যোগ দিলো। মন্টু চেঁচিয়ে বলে উঠলো, তালি শুনে জয়নাল, হয়ে গেলো পয়মাল। হাততালির চোটে সেটা অন্য কারো কানে না পৌঁছালেও ঠিকই পৌঁছালো জয়নালের কানে। সে রেগে ভোম হয়ে রইলো।

ম্যাজিশিয়ান সাহেব মঞ্চে উঠলেন। তিনি পরেছেন কোট-প্যান্ট-টাই। মাথায় একটা হ্যাটও আছে। মঞ্চে উঠেই তিনি হ্যাটটা খুলে সবাইকে অভিনন্দন জানালেন। আর অম্নি একটা রসিক পাখি টার্গেট প্রাকটিস খেলায় সফলতা অর্জন করলো। তার নিক্ষেপিত বর্জ্যবাণ পড়লো সরাসরি জাদুকরের মাথায়। সকলে আরো জোরে হাততালি দিয়ে উঠলো।

জাদুকর কিছুই বুঝলেন না। হাততালির প্রাবল্যে খুশি হয়ে তিনি শূন্যে হাত বাড়ালেন। অম্নি তার হাতে চলে এলো একটা লাল গোলাপ। তিনি সেটা নিয়ে গিয়ে দিলেন হেড স্যারকে। হেড স্যার ধন্যবাদ জানালেন জাদুকরকে। তখন জাদুকর ফট করে হাত দিলেন হেড স্যারের কানের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে চলে এলো একটা টেবিল টেনিস বল। ছেলেরা হাসি গোপন করার চেষ্টা করে কেউ সফল কেউ ব্যর্থ হলো।

জাদুকর আব্দুল মালেক এবার একটা গেলাস রাখলেন মঞ্চের উপরে রাখা টেবিলে। তাতে ভরলেন কাগজের ছোট ছোট টুকরা। তারপর গেলাসটা ঢাকলেন কালো কাপড়ে। তার জাদুর কাঠিটা তিনি নাড়তে লাগলেন গেলাসের উপরের শূন্যে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছে। জাদুকর বিড়বিড় করে মন্ত্র

পড়েই একটানে সরিয়ে দিলেন গেলাসের ঢাকনা। ওমা একী! গেলাসের ভেতরে কাগজের টুকরা কই ? তার বদলে গেলাস ভরা চিনি। জাদুকর গেলাসটা থেকে চিনি নিয়ে একে ওকে দিলেন খেয়ে দেখার জন্যে। ভয়ে কেউ খাচ্ছে না। তখন মন্টু এগিয়ে গেলো সামনে। বললো, আমাকে দিন। জাদুকর তাকে দিলেন এক মুঠো চিনি। মন্টু নির্ভয়ে হাতের তালুতে জিভ ছোঁয়ালো।

জাদুকর আরো আরো জাদু দেখালেন। এর মধ্যে একটা খুবই মজার। এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের হাতঘড়িটা নিয়ে তিনি সেটাকে রাখলেন এটা রুমালের মধ্যে। তারপর রুমালটা রাখলেন একটা বাকসোয়। আর বাকসোটা দিলেন হেড মাওলানা স্যারকে। একটু পর বাকসো খুলে দেখা গেলো হাতঘড়িটা নেই। এসিস্ট্যান্ট হেড স্যার কাঁদকাঁদ গলায় বললেন, ম্যাজিশিয়ান সাহেব, আমার ঘড়িটা শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া। ওটা খোয়া গেলে আমার স্ত্রী আমাকে কিন্তু ঘরে ঢুকতে দেবে না। স্যাররা সবাই হেসে উঠলেন।

জাদুকর তখন একটা পেঁপে কাটলেন। কী আশ্চর্য, ঘড়িটা বের হলো পেঁপের ভেতর থেকে। তীব্র তুমুল হাততালির মধ্য দিয়ে জাদু প্রদর্শনী শেষ হলো। তখন হেড স্যার মঞ্চে উঠে একটা ফুলের মালা (স্কুলের বাগানের ফুল দিয়ে তৈরি, মালির বানানো) জাদুকরের গলায় পরিয়ে দিলে। আর পকেট থেকে বের করে দিলেন ৫০ টাকার একটা নোট। মাইকে বললেন, এই অসাধারণ শিল্পীকে তার যোগ্য পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবু আমাদের কাছে উপস্থিত যা আছে তা থেকে কিছু কিছু দিয়েই আমরা তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। স্যাররা কিছু কিছু টাকা-পয়সা দিলেন, ছাত্রদের মধ্য থেকেও আটআনা একটাকা উঠলো কিছু কিছু।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলো। সবাই যার যার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। কিন্তু একজন তার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো না। মন্টু। সে তক্কে তক্কে রইলো জাদুকর কোথায় যায় ? কিছুক্ষণ পর যখন পুরো স্কুল ফাঁকা হয়ে গেছে, তখন জাদুকরের দেখা পাওয়া গেলো। তিনি তখন স্যারদের কমনরুম থেকে বের হচ্ছেন।

মন্টু তার পিছু নিলো।

জাদুকর সাহেব বটগাছের পেছনে গিয়ে তার ঝোলাটা নামালেন। তারপর টাকা-পয়সা গুনতে লাগলেন। মন্টু একটু দূরে সরে রইলো। জাদুকর সাহেব

যখন ঝোলা কাঁধে আবার হাঁটতে লাগলেন, তখন মন্টু তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলো। জাদুকর বললেন, কী ব্যাপার, তুমি আমাকে ফলো করছো কেন?

মন্টু বললো, আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

'বলো।'

'আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। আপনার সঙ্গে থেকে জাদু শিখতে চাই।'

'আমার ম্যাজিক তোমার ভালো লেগেছে?'

'হ্যাঁ। খুব।'

'কোন জাদুটা তোমার বেশি ভালো লেগেছে?'

'সব।'

'সবগুলো জাদুই তাহলে তুমি শিখতে চাও?'

'না। একটা জাদু শিখলেই আমার চলবে।'

'একটা জাদু। বাহ, তোমার শখ তো ভারি অদ্ভুত।'

'আপনি আমাকে জাদুটা শেখাবেন?'

'না। জাদু কেউ কোনোদিন কাউকে শেখায় না। তাহলে তো জাদু আর জাদু থাকে না।'

'তা হলে আপনি শিখলেন কার কাছ থেকে?'

'আমার ওস্তাদের কাছ থেকে।'

'তাহলে আপনি আমার ওস্তাদ হবেন।'

'আমার ওস্তাদ আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আমি পাশ করেছিলাম। তারপর তিনি আমাকে শেখাতে রাজি হয়েছিলেন।'

'কীসের পরীক্ষা?'

'সাহসের। ইচ্ছার।'

'সেটা কেমন?'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন অমাবশ্যার রাতে গোরস্থানে যেতে। গিয়ে একটা লাল নিশান পুঁতে আসতে। আমি গিয়েছিলাম।'

'আমিও পারবো।'

'তারপর তিনি বললেন, ঠান্ডার দিনে এক ঘন্টা গলা পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমি তাও করেছিলাম।'

'এটাও আমি পারবো।'

'আচ্ছা কোন জাদুটা তুমি শিখতে চাও বলো তো।'

'ওই যে আপনি একটা গেলাসে কাগজ রেখে সেগুলোকে চিনি বানালেন, সেটা।'

'কেন বলো তো। ওই একটা জাদু কেন তুমি শিখতে চাও?'

'কারণ ওই জাদু শিখে আমি কাগজ দিয়ে চিনি বানাবো। পারলে ভাত বানাবো। তরকারি বানাবো।'

'খোকা তোমার নাম কী?'

'আমার নাম মোঃ আশরাফুল আলম মন্টু।'

'মন্টু আজ সকালে তুমি কী দিয়ে ভাত খেয়েছ?'

'আজকে আমি এখনও কিছুই খাইনি।'

'কেন, তোমার খিদে লাগে নি?'

'না, আমার এত খিদে পায় না। কিন্তু আমার ছোট ভাইটার খুব খিদে পায়। ও খুব ছোট তো বুঝতে পারে না। আমি তো বড়, আমি সব বুঝি। আমাদের তো বাবা নেই। মারা গেছেন। মা একলা মানুষ। আমাদের ঠিকমতো খেতে দিতে পারেন না। আপনি যদি আমাকে খাবার বানানোর জাদুটা শিখিয়ে দেন, তা হলে আমি বাসায় গিয়ে নানা খাবার বানিয়ে আমার ছোট ভাইটাকে খাওয়াতে পারবো।'

'তোমার কথা শুনে আমার খুব মায়া লাগছে মন্টু। আমি ঠিক করেছি তোমাকে আমি জাদুটা শেখাব। চলো আগে একটা হোটেলে যাই। আমার নিজেরই খুব খিদে লেগে গেছে। দুজনে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

মৌসুমী রেস্টুরেন্টে বসে জাদুকর দু প্লেট ভাতের অর্ডার দিলেন। ভাত খেতে খেতে তারা গল্প করতে লাগলো।

জাদুকর বললেন, খুব মন দিয়ে শোনো। তার আগে তো তোমার পরীক্ষা নেওয়া দরকার। জাদু শেখার ব্যাপারে তোমার আদৌ কোনো আগ্রহ আছে কিনা।

'আছে, খুব আছে।'

'যা বলবো, মন দিয়ে শুনতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শোনো। সব জাদু হলো হাতের প্যাঁচ। নানা বৈজ্ঞানিক কৌশল। যেমন ধরো একটা বড়শি শুকনো মাটিতে ফেলে তুমি একটা টান দিলে, আর উঠে গেলো একটা জ্যান্ত মাগুর মাছ। এ ম্যাজিকটা দেখানোর জন্যে তোমার বড়শিতে সুতা থাকতে হবে দুটো। একটার মাথায় আগে থেকেই একটা মাগুর মাছ গেঁথে তুমি রাখবে হাতের মুঠোয়। তারপর অন্য সুতাটা বড়শিসহ তুমি ডাঙ্গায় ফেলে নাড়াতে থাকবে। যখন টান মারবে, তখন হাতের মুঠোর মাছটা ছেড়ে দিয়ে টান মারতে হবে। ব্যস লোকে মাছটাই দেখবে। খালি সুতা আর বড়শিটা দেখবেই না। তেমনি কাগজ আর গেলাসের জাদুতে তোমাকে আগে থেকেই চিনি কিনে এনে রাখতে হবে অন্য একটা গেলাসে।'

'কিনে আনতে হবে ?' মন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এ জাদু শিখে আমার লাভ নাই।'

'তা নাই। সে জন্যে তোমাকে একটা অন্য জাদু শেখাবো। এই জাদুটা ঠিকমতো শিখলে তুমি অনেক খাবার বানাতে পারবে। শিখবে ?'

'হ্যাঁ। শিখবো।'

'মন্ত্র শিখে সেটা যদি না ব্যবহার করো তা হলে কিন্তু আমি তোমার উপর ভয়ানক রাগ করবো। কী, ঠিক মতো মন্ত্রের ব্যবহার করবে তো ?'

'হ্যাঁ। করবো।'

'মন্ত্রটা আর কিছুই নয়, ঠিকমতো প্রতিদিন মন দিয়ে লেখাপড়া করা। তুমি গরিব, কিন্তু গরিবের রয়েছে মাত্র একটা মন্ত্র। সেটা হলো লেখাপড়া করা। যদি তুমি ঠিকভাবে লেখাপড়া করো, দেখবে একদিন ঠিকই তুমি তোমার মা ভাইয়ের দুঃখ দূর করতে পেরেছ। বুঝেছ ?'

'জি।'

পরের সপ্তাহে সমাজবিজ্ঞান স্যারের ক্লাসে আবার জয়নাল গরুমারা বেত নিয়ে এলো। স্যার বললেন, যারা পড়া মুখস্থ করে এসেছিস তারা বস।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে মন্টু বসে পড়লো। জয়নাল বললো, স্যার মন্টুও বসেছে স্যার।

'তাতে তোর কী ?'

'মন্টু স্যার জীবনেও পড়া করে আসে না স্যার।' জয়নাল মনে করিয়ে দিলো স্যারকে।

'আচ্ছা জয়নাল তুই বল তো, বাবরের পর কোন মোগল সম্রাট দিল্লির সিংহাসনে বসেন ?' স্যার উল্টো জয়নালকে পড়া ধরলেন।

জয়নাল আমতা আমতা করতে লাগলো।

'মন্টু তুই বল।' স্যারের হুংকার।

'হুমায়ুন স্যার।' মন্টু চটপট বলে দিলো।

'মন্টু তুই জয়নালের কান টেনে দে।' স্যার নির্দেশ দিলেন। স্যারের নির্দেশ মন্টু কি আর অমান্য করতে পারে ? সে জয়নালের কানে হাত দিলো। পুরো ক্লাস খুশিতে নড়েচড়ে বসলো।

বহুদিন পরের কথা। একদিন বৃদ্ধ জাদুকর আবদুল মালেকের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। ভদ্রলোক এসেই সোজা জাদুকরের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। তারপর বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন, আমার নাম মন্টু। ছেলেবেলায় আমাদের স্কুলে আপনি গিয়েছিলেন জাদু দেখাতে, সেখানে গিয়ে আপনি আমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। মনে পড়ছে ?

'হ্যাঁ, বাবা, অল্প অল্প মনে পড়ছে। তা বাবা তুমি আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

'টেলিভিশনে আপনার একটা জাদু দেখালো না সেদিন ? সেখান থেকে বের করেছি। বহুত কষ্ট হয়েছে।'

'তা বাবা কী মনে করে ?'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাবো। আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে।'

মন্টু সাহেব বৃদ্ধ জাদুকর আব্দুল মালেককে নিয়ে গেলেন একটা বিশাল কারখানার সামেন। একটা চিনির কারখানা। বললেন, আমি এই কারখানাটার

এখন মালিক। ছোটবেলায় আপনি আমাকে এই চিনি বানানোর মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মন্ত্রটা হলো...

জাদুকর বললেন, ঠিকমতো লেখাপড়া করা।

'হ্যাঁ। সেই মন্ত্র থেকেই আমার জীবনের এই উন্নতি। আপনার মন্ত্র আমি কোনো দিন ভুলিনি। আর আপনাকেও আমি কোনো দিন ভুলি নি।'

জাদুকর মন্টু সাহেবকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আনন্দের কান্না। মন্টুর দু চোখ ভেঙেও জল আসতে লাগলো। আনন্দাশ্রু। কারখানার সব লোক তাদের স্যারের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পাঠাগার : বিশ্বসাহিত্য
SEQAEP

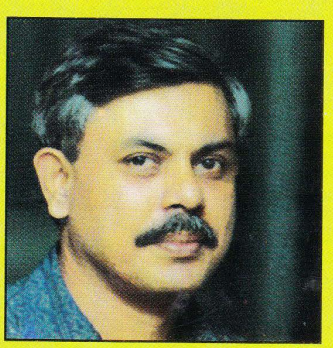

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো. মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জেলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সহকারী চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে উপ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশনের জন্যে চিত্রনাট্য, ভ্রমণ কাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা–নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়। বই বেরিয়েছে ১০০টির মতো। তার রচিত টেলিভিশন কাহিনীচিত্রের মধ্যে নাল পিরান, প্রত্যাবর্তন, করিমন বেওয়া, প্রতি চুনিয়া, ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন, মেগা সিরিয়াল ৫১ বর্তী প্রভৃতি দর্শকনন্দিত হয়েছে। তার রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ব্যাচলর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ টিভি নাট্যকার হিসেবে ব্যাচসাস পুরস্কার, টেনাশিনাস পদক, ট্রাব এওয়ার্ড, কালচারাল রিপোর্টাস এওয়ার্ডসহ পেয়েছেন খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক পাউন্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস মা পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন– 'আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। ... এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।

ISBN 984 864 001 X
9 789848 640012

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP)-এর পাঠ্যভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়